দুবরাজপুর পল্লী সমাজের পরিচয়।

প্রত্যেক বংশের অনৈক ব্যক্তি	নিবাস	অবলম্বন	৩৭ পর্য্যায়ের আশ্রম	৪২ পর্য্যায়ের গাঁই	গোত্র	কৌলিন্য	মন্তব্য সূচক উপাধি।
শ্রীউদয়চন্দ্র সিংহ	দুবরাজপুর	ব্যবসায়	সিংহ	„	ভরদ্বাজ	মৌলিক	„
শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত	ঐ	ঐ	দত্ত	„	শাণ্ডিল্য	কুলীন	„
শ্রীরাখালচন্দ্র দে	ঐ	ঐ	দে	„	কপিলর্ষি	ঐ	„
শ্রীখুদীরাম খাগ	ঐ	ঐ	খাগ	„	মধুকৌল্য	মৌলিক	„
শ্রীরামরঞ্জন গণ	„	চাকরী	গণ	„	শাণ্ডিল্য	„	„
শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ভদ্র	„	„	ভদ্র	„	„	„	„
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন	„	কৃষি	সেন	„	„	কুলিন	„
শ্রীরাখাল দাস ভুঁঞি	হেতমপুর	ব্যবসায়	ভুঁঞি	„	„	„	„
শ্রীবাগালচন্দ্র ঘোষ	„	„	ঘোষ	„	„	„	„
শ্রীরামসুন্দর কুণ্ডু	„	„	কুণ্ডু	„	„	„	„
শ্রীমহানন্দ আশ	বশপুর	মহাজনী	আশ	„	„	„	„
শ্রীদিনবন্ধু পাল	„	কৃষি	পাল	„	„	কুলিন	„
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রক্ষিত	„	তাম্বূল ব্যবসায়	রক্ষিত	„	„	„	„

শ্রীকৈলাশনাথ শীল	নয়াছমকা	"	শীল	"	"	"	"
শ্রীমহেশ্বর কর	"	"	কর	"	"	"	"
শ্রীঅচিন্তলাল বৰ্দ্ধন	"	"	বৰ্দ্ধন	"	"	"	"

বনকাটীর "গোয়ালপেড়ে" অষ্টগ্রামী।

তাম্বূলী সমাজ মাসিক পত্রে এই সমাজের পরিচয় যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বোলপুর নিবাসী বাবু রাখালদাস ভদ্র মহাশয় বলেন, "আমরা বীরভূম অষ্টগ্রামী সমাজভুক্ত"। আমার পিতামহের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের অনেকেই মেদিনীপুরে আছেন। কিন্তু দূরতা পরিহার জন্য আমরা এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানেই পুত্র-কন্যার বিবাহ আদি দিয়া থাকি। মেদিনীপুরবাসী অষ্টগ্রামী তাম্বূলি মহাশয়েরা, বোধ হয়, এক্ষণে আমাদের চিনিতে পারিবেন না। আমরাও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত। সভা না হইলে, যেমন পুরুষানুক্রমে আমরা অপরিচিতভাবে রহিয়াছি, সেইরূপই থাকিতাম। অতএব সভা এবং আমাদের পত্রিকা পথপ্রদর্শক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ আমাদের সভাকে জীবিত রাখুন। বিবাহ আদি আদান প্রদান কুসংস্কার কাটিলেই ক্রমে হইবে। উপস্থিত আমরা যে কত নূতন নূতন স্বজাতির সহিত পরিচিত হইতেছি, ইহাও কম লাভ কি? অবশ্য ইহাকে আমরা সৌভাগ্য মনে করিতেছি।

"আমাদের দলের কুলচি আছে, কি না, জানি না। কৈ কাহার কাছেও শুনি নাই। কি জন্য, কেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ স্থানে আসিয়াছিলেন, তাহাও আমি জানি না। অবশ্য অন্যের জানা থাকিলে বলিবেন। বর্ত্তমানে আমরা বোলপুরে কয়েক ঘর, সিরশায় আন্দাজ ৫ ঘর, ইলামবাজারে অনুমান ২৫ ঘর, বনকাটি অযোধ্যায় অনূন ৪০ ঘর এবং সাতকাহনায় অনুমান ৫ ঘর, এই হইল আমাদের সমাজের পরিমাণ। ইহার মধ্যেই আমরা পুত্র-কন্যার বিবাহ আদি দিয়া পুরুষানুক্রমে সুখ-দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি। আমরা কেহই কৃষক নহি; অতএব আমাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম এবং তাঁহাদের ঠিকানা নিম্নে লিখিলাম।

পোষ্ট বোলপুর (লুপলাইন) শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর হালদার বি, এ, বি, এল, উকিল বোলপুর এবং শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দে প্রভৃতি।

পোষ্ট—হাতেমপুর, গ্রাম সিরশা, জেলা বীরভূম। শ্রীযুক্ত রামকল্প নায়ক। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নায়ক। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী নায়ক।

পোষ্ট—ইলামবাজার, উক্ত গ্রাম, জেলা বীরভূম। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ আশ। শ্রীযুক্ত হেলারাম দে। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র পাল। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে।

পোষ্ট—বনকাটি, গ্রাম অযোধ্যা, জেলা বৰ্দ্ধমান। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রক্ষিত। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব হালদার। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভদ্র। শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রক্ষিত।

পোষ্ট—বনকাটি, গ্রাম সাতকাহনা, জেলা বৰ্দ্ধমান। শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র হালদার। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত হালদার। শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ন শীল। ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম অধিবেশনে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের কুলীন—আশ, দাস, দে, দত্ত, পাল, ভদ্র, শীল, রক্ষিত এই আট ঘর। পূৰ্ব্বে কুলীনদিগের কি প্রাপ্য ছিল জানি না, এখন কিছুই দিতে হয় না। ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করা অথবা যিনি দশজনকে প্রতিপালন করেন, এখন তিনিই কুলীন।”

কোতরাপুরের উৎকল অষ্টগ্রামী।

এই সমাজে কৌলিন্য প্রথা নাই। ইহাদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউ। কৌলিন্যের বিশেষ পক্ষপাতী অষ্টগ্রামীর এই শাখা সাম্যবাদের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বৃত্তাকারে আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর করিয়া মর্য্যাদার তুল্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই নিদর্শন পত্রের নাম চাঁদ। ইহাতে এক জনের নিম্নে অপরের নাম নাই। আমরা স্থানাভাব বশতঃ (চাঁদের) অবিকল নামের পদ্মবন্ধবৎ চিত্র দিতে পারিলাম না, তবে সাধারণের বিদিতার্থ যথা সম্ভব স্থূল প্রতিকৃতি পরপৃষ্ঠায় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল।

তাম্বূলী সমাজ মাসিক পত্রে প্রকাশিত কটক শাখা সমিতির কার্য্য বিবরণ হইতে সভাস্থলে উপস্থিত এই সমাজের ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিশেষে সভা সংক্রান্ত দুই একটি কথা উদ্ধৃত হইল।

"নাম যথা;—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুঁই দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত বংশীধর সাহা, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গুঁই দাস, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুমোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত রাধামোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন মল্লিক, শ্রীযুক্ত মদনমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন গুঁই দাস, শ্রীযুক্ত নাককুড়ি মল্লিক, শ্রীযুক্ত হরিদাস মল্লিক, শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি।

সভায় প্রস্তাব্য ছিল (১) সম্মিলন এবং (২) শাখাসমিতির গঠন। সম্মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধিকালাল সিংহ মহাশয় সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে, সম্মিলন হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হইয়াছে। আর শাখা-সমিতিও খোলা হইয়াছে। শাখা-সমিতির স্থায়ী সভাপতি হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুঁই দাস। সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন নন্দী। অবশিষ্ট তথাকার অপরাপর কুটুম্ববর্গ মাত্রেই এই সভার সভ্য হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইয়াছিল।

কটকে ৭০ ঘর আমাদের স্বজাতি আছেন। ইহা ভিন্ন জাজপুর জেলার অন্তর্গত কোত্রাপুর গ্রামে আন্দাজ ৩ শত ঘর আমাদের কুটুম্ব বাস করেন। এই সকল স্থানের কার্য্য কটক এবং ভদ্রকের শাখা-সমিতি দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে। এই দুই স্থানের স্বজাতিবর্গই "কোত্রাপুরের অষ্টগ্রামী সমাজের অন্তর্গত।"

খড়্গাপুরের "সংসেরে" ৪২ গ্রামী।

জাতিভেদের অপূর্ব্ব নিয়মের ফলে মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে কয়েক জন কৃষিজীবি একত্রিত হইয়া এক নূতন দলের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবনসংগ্রাম সংসারের অতি চমৎকার সামগ্রী। মেদিনীপুরের অষ্টগ্রামী বীরভূমের বনকাটীতে, বাঁকুড়ার সংসেরে ৪২ গ্রামী খড়্গাপুরে, পরস্পর বাস স্থান বিনিময় করিয়া লইয়াছেন। শাওড়া গ্রাম মেদিনীপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত। এই সমাজের জনৈক ব্যক্তি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ কুণ্ডু তথায় বাস করেন।


ইং সন ১১৬৯ সাল।
শ্রীগরিববর্দ্ধন
শ্রীমানিক দে
শ্রীশিবাই দে
শ্রীনিধি বর্দ্ধন
শ্রীখোসালি বর্দ্ধন
শ্রীনিধি নন্দী
শ্রীমানিক গুঁই

সমাজভেদ।

তাম্বূলীর এ পর্য্যন্ত ১২টী সমাজ নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১টী গঙ্গার পশ্চিমপারে ও ১টী মাত্র কুশদহ সমাজ গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। সিংহ-ভূমে এক দল তাম্বূলী আছেন, তাঁহারা ৪২ গ্রামী নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাতে একটি ঐতিহাসিক রহস্য প্রকাশিত হইতেছে। সিংহভূম যেমন বেহার ও বাঙ্গালার মধ্যপথে অবস্থিত, তদ্রূপ সিংহভূমের তাম্বুলী হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর মধ্য পথে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের আচার ব্যবহারে হিন্দুস্থানী ভাব আছে। তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া বঙ্গীয় তাম্বূলীর ৪২ গ্রামী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান হইতে যাইয়া সিংহভূমে বাস করিলে বঙ্গীয় তাম্বূলীর ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। চাঁইবাসার তাম্বূলী দল যদি আকারে আর্য্য না হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে আর্য্যীকরণে গৃহীত মুণ্ডা কহিতাম। ছোটনাগপুরে অনার্য্য মুণ্ডা জাতি হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুর ভাষা গ্রহণ করিতে বিশেষ তৎপর। তাহারা স্বদেশ হইতে জীবিকান্বেষণে অন্যত্র গমন করিয়া তথায় পুরুষানুক্রমে বাস করিলে মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ভাষা গ্রহণ করিতে সচরাচর বাধ্য হইতে দেখা যায়। মাতৃভাষা পরিত্যাগ না করিলেও মুণ্ডাদিগকে লোহার, মালি তাঁতি প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় জাতির নাম গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে। ভূমিজ মুণ্ডা জাতির মধ্যে সিংহভূমে তামুলিয়া নামে একটী শ্রেণী আছে। সিংহভূমের ৪২ গ্রামী তাম্বূলী সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত তামুলিয়া শ্রেণীর সংস্থাপক, একথা বলা সংগত হইবে না। বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী, ভুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী, খড়্গাপুরের সংসেরে ৪২ গ্রামী, বাঁকূড়ার রাজহাটী, ও অষ্টগ্রামী প্রভৃতি তাবৎ সমাজের লোক বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছেন, ইহা অসম্ভব। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাঁকুড়া অঞ্চলে হিন্দুস্থানী তাম্বূলীরা বাস করিয়া বাঙ্গালিত্ব প্রাপ্ত হইলে বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ হইতে আগত স্বজাতির সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য বঙ্গীয় শ্রেণী দ্যোতক সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তৎসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। নহিলে স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে সংখ্যাধিক্য হইবার অন্য কোন কারণ অনুমিত হয় না।

তাম্বূলীকুলের দ্বাদশটী সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কৌলিন্য সম্পন্ন, কৌলিন্য বর্জ্জিত। সম্বন্ধ নির্ণয় স্থলে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, তাবৎ সমাজ এক মূল হইতে উৎপন্ন। পরস্পরের নিকট যখন পরিচিত হইলাম, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করা আর কঠিন হইবে না। সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে হইলে কৌলিন্য সম্পন্ন ও কৌলিন্য-বর্জ্জিত সমাজে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হইবে। এতৎ নিরাকরণার্থ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাম্বূলি সমাজ মাসিক পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। বিভিন্ন সমাজের বিবাহ পদ্ধতি একরূপ নহে। তৎপ্রদর্শনের জন্য উপরোক্ত পত্র হইতে বৈবাহিক লিপি গৃহীত হইয়াছে।

"কৌলীন্য প্রথা ভদ্র-সমাজ মাত্রেরই অঙ্গবিশেষ, এবং পূর্ব্বাবধি সকল ভদ্র সমাজে কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে ইহার মূলোচ্ছেদ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। তাহা হইলে আমাদের সকল তাম্বূলি সমাজে সম্মিলনে ব্যাঘাত জন্মিবে। যদি কোন ব্যক্তি এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত করা আবশ্যক নহে, তাহা হইলে তাম্বূলি সমাজ ভদ্র-সমাজ বলিয়া গণ্য হইবে না ও সকল থাক সম্মানিতও হইবে না। আর একটী বিষয় বলা হইতেছে যে, সমাজের যেরূপ নিয়ম পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। সে নিয়ম আপন আপন সমাজে প্রচলিত থাকিলে অন্য সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কেবল মাত্র অন্য সমাজের সহিত বিবাহ কার্য্য উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মে সমাজ আবদ্ধ থাকা ভাল বলিয়া বিবেচনা হইতেছে।

বিবাহে কৌলীন্য বিষয়ে বক্তব্য—কন্যাকর্ত্তা কুলীন কিম্বা মৌলিক হউন না কেন, কন্যা-সম্প্রদান সময়ে যখন তাঁহাকে নম্রতা স্বীকার করিতে হয় এবং সমাজ হইতে পাত্রপক্ষীয় সমাজের সম্মান দিতে ও আবদার সহ্য করিতে হয়, তখন সকল সমাজের পাত্র-পক্ষের কৌলীন্য-সম্মান বিবাহ কালীন রক্ষা করার নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, পরস্পর কোন সমাজেই কৌলীন্য বিষয় লইয়া বিবাদ হইবে না।

যে কোন সমাজে শ্রাদ্ধাদি সমারোহের কার্য্য উপস্থিত হইবে, এই সমাজের মালাচন্দন সেই সমাজেরই কুলীন মহাশয়ের সম্মানার্থ ব্যবহার করা নিয়ম থাকিলে পরস্পর কোন সমাজেই কৌলীন্য সম্মান লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইবেক না।"

বিবাহ পদ্ধতি।

(তাম্বূলী সমাজ মাসিক-পত্র হইতে উদ্ধৃত)

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী সমাজের বিবাহ।

গাত্র হরিদ্রার দিন সধবা স্ত্রীলোকে বরের গা'য়ে তেল হলুদ দিয়া হাতে হরিদ্রা সূতা এবং দূর্ব্বা বাঁধিয়া দেয়। তৎপরে এই তেল হলুদ এবং তৎসঙ্গে সিন্দুর, চিরুণী, দর্পণ, মাথাঘসা, তেলের মশলা, /২ /৩ সের হইতে /৫ /৬ সের পর্য্যন্ত সন্দেশ যিনি যেমন পারেন, এই সকল দ্রব্য কন্যার বাটী পাঠান হয়; তথায় কন্যার গায়ে এই তেল হলুদ সধবা স্ত্রীলোকে দিয়া, তাঁহারও হস্তে দূর্ব্বা এবং সূতা বাঁধা হয়।

গাত্র হরিদ্রার পর বর বা কন্যার আত্মীয়েরা স্ব স্ব বাটিতে নিমন্ত্রণ করিয়া ইহাদের ভোজন করান, ইহাকে আইবুড়া ভাত বলে।

বিবাহের দিন বর সভাস্থ হইলে, সেই সভায় দান সামগ্রী, যথা—পিত্তলের ঘড়া, গাড়ু, থালা, বাটী, ইত্যাদি বিবিধ তৈজসপত্র পাটী, সিন্দুর চুবড়ী, দর্পণ, চিরুণী ইত্যাদি যিনি যত দিতে পারেন—আজকাল ২।৪ খানা রূপার বাসনও ভাল ছেলেকে দেওয়া হইতেছে—এসকল দ্রব্য সভাস্থলে সাজাইয়া দিতে হয়। বিবাহের লগ্ন নিকটবর্ত্তী হইলে, কন্যাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতির অনুমতি লইয়া কন্যা সম্প্রদানের উদ্যোগ করেন। এ সময় কুলীনের সম্মান রক্ষা করিতে হয়।

ইঁহাদের কুলীন সেই পরশুরামের প্রণীত কুলচী অনুসারে,—

দে, দত্ত, পাল, সেন প্রধান চারি ঘর।
পরশুরাম দাস কহে শুন তার পর॥

এই প্রবচনে যে চারি ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীনের উল্লেখ আছে, ইঁহারা অদ্যাপিও উক্ত চারিঘরকেই কুলীন বলিয়া সম্মান করেন। বিবাহের সভায় এই চারিঘরের যিনি উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে "ডালা" দেওয়া হয়। যদি চারি ঘরই উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখিয়া "ডালা" দেওয়া হয়। একখানি থালায় পান, সুপারি এবং কিছু সন্দেশ রাখিয়া উহা রুমাল ঢাকা দিয়া "ডালা" করা হয়। ইহাই কুলীনের প্রাপ্য।

তৎপরে কিছু কিছু পান সুপারি সভাস্থ অন্যান্য স্বজাতীয়দিগকে দেওয়া হয়। বরের সম্মান—ছেলে পাস করা হইলে কিছু নগদ টাকা, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরি, ঘড়ি, চেইন এবং কন্যাকে স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার ইচ্ছামত যা পূর্ব্বচুক্তি মত দিতে হয়। ছেলে ভাল না হইলে এবং গরীব দুঃখীর কন্যা হইলে লোকে ঐরূপ কন্যার পণ লইয়া বিবাহ দিয়া থাকেন।

বিবাহরাত্রে কন্যার মাতুলের কিছু প্রাপ্য আছে। ইহাকে "মাতুল-সন্তাস" বলে। মাতুল-সন্তাসের টাকা বরপক্ষকে দিতে হয়। যিনি যেমন পারেন, ৮৲ ১০৲ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত চুক্তি হয়। টাকা না দিলে, মামা ভাগিনেয়ীকে আটক করেন, সভাস্থ হইতে দেন না। কাজেই টাকা দিতে হয়। মামা কিন্তু এ টাকা লইয়া আত্মসাৎ করেন না, বরং উহার সঙ্গে আরও কিছু মিশাইয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎ সভায় গিয়া বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্র মাতুল স্থলবিশেষে টাকা পুনঃপ্রদান-বিষয়ে কৃপণতা করেন, তাহাও শুনা যায়।

জ্যেষ্ঠ জামাতার বরণের জোড়া কাপড় দিবার নিয়ম। এক্ষণে উহার স্থলে ধুতি চাদর দেওয়া হয়। মাতুল-সন্তাসের পর কন্যাকে সভাস্থ করা হয়। এবং এখানকার কার্য্য শেষ হইলে, বরকে ছাঁদলাতলায় লইয়া গিয়া, "সাতাশ খাড়ি" ঘুরান হয়। এ ছাঁদলাতলায় স্ত্রীলোকের সম্পর্ক নাই। শুনা যায়, শুভদৃষ্টি সভাতেই হয়। এখানে কেবল ২৭টী ছোট ছোট মশাল জ্বালাইয়া, উক্ত ২৭টী মশাল ৭জন পুরুষে অংশমত লইয়া বরকে প্রদক্ষিণ করেন। ইহারই নাম "সাতাশ খাড়ি বা সাতাশবর্ত্তিকা।" ইহার পর বরকে বাসর ঘরে লইয়া যাওয়া হয়।

এই সম্প্রদায়ের বরযাত্রীর বিশেষ সম্মান আছে। তাঁহাদের আহার দিয়া রাত্রে রাখিতে হয়। যতই বরযাত্রী থাকুন না কেন, পরদিন কন্যার পিতাকে মোটের উপর দেড়টাকা দিতে হয়। পরন্তু আর একদিন যদি ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ৪॥০ টাকা সম্মান লাগে। তৎপরে যতগুলি বরযাত্রী গমন করেন বা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের ঐ টাকা অংশমত প্রাপ্য। ইহা কেহ লয়েন, কেহ বা লয়েন না। স্বজাতীয় বরযাত্রীর পক্ষে এই সম্মান। কিন্তু অন্য জাতীয় বরযাত্রী থাকিলে, তাঁহাকে রীতিমত লৌকিকতা অর্থাৎ বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মান রক্ষা করিতে হয়।

বিবাহের পরদিন বরকন্যা যখন ইচ্ছা যাইতে পারেন। এই সম্প্রদায়ে ফুলশয্যা নাই। বৌভাত আছে। উক্তদিন বরের বাটীতে অন্ন-যজ্ঞ হয়। বৌ

রান্না ঘরে গিয়া, দাঁড়াইয়া খাদ্য দ্রব্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেই বৌভাতের উদ্দেশ্য সমাধা হইয়া যায়। তৎপরে বর সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়ী আগমন করেন। ইহাকে জোড়ে আগমন করা বলে। ৭।৮ দিন থাকেন। এই সময়ে বর নমস্কারী টাকা দিয়া, কন্যাপক্ষের গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। দ্বির-গমন কুত্রাচিৎ; ইঁহাদের "ধুল পায়ে লগ্ন" নচেৎ ১ বৎসরে ১।৷৹ বৎসর পরেও হয়। এই সময় ফুলশয্যার মত দ্রব্যাদি দিতে হয়। মৎস্য, দুগ্ধ, চিড়া, মুড়কি, সন্দেশ ইত্যাদি দিতে হয়। ভোদোর লাড়ু বা ভুষির লাড়ু এই সময় দিতে হয়। অন্ততঃ ১ মণ চাউল ভাজার গুঁড়ায় গুড় এবং অন্যান্য মশলা দিয়া; এই লাড়ু প্রস্তুত করা হয়। এই সময় কন্যার সহিত নমস্কারী কাপড় দেওয়া হয়। এই বস্ত্র দিয়া কন্যা বরের গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। নূতন কুটুম্ব খাওয়ান ইঁহাদের নাই।

১৪ গ্রামী সমাজের বিবাহ।

এই সমাজ মহাত্মা ষষ্ঠীবর সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। ১৪৬১ শকাব্দায় চৌদ্দঘর ৪২ গ্রামী তাম্বূলী দ্বারা ইহার সৃষ্টি। বর্ত্তমান লোকসংখ্যা অনুমান ৮ হাজার।

এই সুবৃহৎ সমাজে কৌলিন্য প্রথা আছে। ৺ষষ্ঠীবর সিংহ মহাশয়ের সম্পর্কীয় যে কেহ, এমন কি তাঁহার পুত্র, কন্যা এবং তাঁহার সভার সভাপতি, সম্পাদক, লেখক প্রভৃতি সকলেই কুলীন পদবাচ্য। অদ্যাপিও ঐ সম্পর্কীয় বংশধরেরা স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছেন। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইঁহাদের কুলমর্য্যাদানুসারে বিবাহের পণ ধার্য্য ছিল।

বরপক্ষকে পণের টাকা না দিলে, এ সমাজে বিবাহ হয় না। পূর্ব্বে দত্ত প্রামাণিকেরা সিংহ মহাশয়দিগের ঘরে বিবাহ করিলে, ১৫১৲ টাকা এবং দত্ত প্রামাণিকের ঘরের মেয়ে সিংহ মহাশয়দিগের ঘরে গেলে, ১৫০৲ টাকা পণ ধার্য্য ছিল। তৎপরে, ৪ ঘর ৬ ঘরে বিবাহ হইলে, সমান পণ—অনুমান ৬০, ৬৫ টাকা ছিল। এইরূপ নির্দ্ধারিত পণে সমগ্র সমাজটীর বিবাহ ব্যাপার পরিচালিত হইত। এখন আর সে নির্দ্ধারিত পণ প্রথা নাই। যিনি যত দর করিয়া লইতে পারেন, এমন কি শুনা যায়, ৪।৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পণ লওয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। ইঁহাদের বংশপরিচয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা হউক, বরকর্ত্তা পণের টাকা লইয়া কন্যার গহনা দিবেন, কন্যার পিতাকে আর গহনা দিতে হয় না। কিন্তু বরকর্ত্তা যত টাকা লয়েন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে গহনা দিতে পারেন। হয়ত দুই হাজার টাকা লইয়া, দুইশত টাকার গহনা দিতে পারেন, অথবা ২ হাজার পাইয়া ৪ হাজার টাকার গহনাও দিতে পারেন।

পণের টাকা, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরি অথবা কুলীনবিশেষ হইলে সুতার কাপড় এবং রৌপ্যাঙ্গুরিও দেওয়া হয়। যেমন জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের বংশে বিবাহ করিলে, সুতার কাপড় এবং রূপার আংটি লইতে হয়। বিবাহ-সভায় পূর্ব্বে কুলীন-বিশেষের পাগড়ি প্রথা ছিল, এখন তাহা রহিত হইয়াছে।

সভা হইতে বর ছাঁদলাতলায় যাইবার পূর্ব্বে বর ও কন্যা উভয় পক্ষের দুই-জন জ্ঞাতি বা উভয়ের পিতা বা খুড়া করযোড়ে পান সুপারির দুইখানি থালা লইয়া প্রথানুসারে অনুমতি লইয়া থাকেন। ৪টা হাঁড়িতে সুপারি লইয়া উভয়ের গুরু পুরোহিতকে সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়। তৎপরে সভাস্থ ব্রাহ্মণ কুটুম্ব প্রভৃতি অপর সমুদয় জাতিকে সুপারি দিতে হয়। এ সুপারি খরচ কেবল বরপক্ষের। বিবাহবিশেষে ২০ মণ সুপারি খরচা হইয়াছে। সচরাচর বিবাহ-সভায় ২মণ সুপারি ব্যয় হয়। সভাস্থ প্রত্যেককে ।০, ।৵০, ॥০ সের পর্য্যন্ত সুপারি দেওয়া হয়। এই জন্য সুপারি বুঝিয়া এবং সভার লোক দেখিয়া অনু-মানে যথানুপাতে উহা বিতরিত হয়।

দান সামগ্রী সভায় সাজাইয়া দিতে হয় না। সে ভাবে দিবার প্রথা নাই। বাসি-বিবাহ নাই। কিন্তু বরণ করা হয়। যাত্রার মন্ত্র নাই। ফুলশয্যা আছে। কিন্তু বিবাহের পরদিন ফুলশয্যার দ্রব্যাদি দিতে হয় না। ৮ দিনের মধ্যে জোড়া দিন বাদে ফুলশয্যা পাঠান হয়। ডাবর ১টা, পাটি ১টা, ফুলচন্দনের বাটি ১টা, থালা ১খান, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি মশলা, ক্ষীর, বাতাসা, মুড়কি ইত্যাদি অবস্থানুসারে দিতে হয়। ২শত হাঁড়ী ক্ষীর, ১৮ ধামা বাতাসা, ৫ মণ মুড়কি ইত্যাদি দিতে দেখা গিয়াছে। উহাতে ফল ফুল চন্দন রীতিমত ভাবে দিতে হয়। দ্রব্যের অভাবে টাকাও ধরিয়া দেওয়া চলে।

বিবাহের পরদিন শয্যা তুলানী যাহা লয়, কন্যা আসিবার সময় "ননদ-খামী" উপহার ডবল ধরিয়া দিতে হয়;—ইহা ননদের প্রাপ্য।

বিবাহের পর ৮ দিনের মধ্যে হাতের সুতা খোলার দিন বরের আত্মীয়েরা

"কনে-দেখা" বলিয়া, কন্যার হস্তে যৌতুক অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে নগদ টাকা এবং গহনাও দিতে পারেন।

বিবাহের পর অবস্থানুসারে নূতন কুটুম্ব খাওয়ান হয়, ইহাই "বৌভাত।" মেয়ের পিতাকে নূতন কুটুম্ব খাওয়াইতে হয় না।

বিবাহের পর বৌভাত ইত্যাদি হইয়া গেলে, বর ও কন্যা জোড়ে বাপের বাটী আসিয়া, ৩ দিন হইতে পনের দিন বা যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন। এই সময় বর নমস্কারী টাকা দিয়া, কন্যার গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। কিন্তু যাইবার সময় একা যাইতে হয়। কারণ ইঁহাদের ১ বৎসর পরে দ্বিরাগমন হয়।

এই দ্বিরাগমনের সময় দান সামগ্রী, মশলা, পাটি এবং আবার ফুলশয্যার মত দ্রব্যাদি দিতে হয়। রীতিমতভাবে বরের গুরুতর ব্যক্তিবর্গকে নমস্কারী কাপড় যথা,—পুরুষের ধুতি চাদর, সধবার সাটী এবং বিধবাকে থান কাপড় দিতে হয়। বর যে শ্বশুর বাটীতে টাকা দিয়া নমস্কার করিয়া আইসে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুদিন পরে উহা ফেরত দিয়া, তৎসঙ্গে হয় এক জোড়া কাপড় না হয় ধুতি চাদর দিতে হয়।

বিবাহের রাত্রে ভাগিনেয় বরণ এবং জামাই বরণ, কৌলীন্যানুসারে গরদের জোড় কিম্বা সূতার বস্ত্র দ্বারা করা হয়।

বরযাত্রীর রাহা-খরচ বরপক্ষকে দিতে হয়।

জাহানাবাদ—অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ।

মেদিনীপুরনিবাসী অনাররী মাজিষ্ট্রেট বাবু দুর্গাদাস রক্ষিত মহাশয় পত্র দ্বারা তাঁহার সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি আমাকে যেরূপ জানাইয়াছেন, তাহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমাদের স্বগোত্রে বিবাহ নাই। বিবাহের দিন বর সভাস্থ হইলে, কন্যাকর্ত্তা কন্যা পাত্রস্থা করিবার জন্য অগ্রে ব্রাহ্মণ, তৎপরে অন্যান্য জাতি, সর্ব্বশেষে স্বজাতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন; অথবা কোন সময়ে সভাস্থ সকল ব্যক্তিগণের সম্মুখে কন্যাকর্ত্তা অনুমতি লইয়াও কন্যা পাত্রস্থা করিয়া থাকেন। ইহাতে অগ্র পশ্চাৎ জাতি বিশেষের বিবেচনা করা হয় না।

সভায় পান সুপারি দেওয়া হয় না এবং দান সামগ্রী সভায় সাজান হয় না, উহা "ছাঁদলাতলায়" সাজাইয়া দিতে হয়।

বরকে নগদ টাকা পণ-স্বরূপ দিবার প্রথা নাই। পূর্ব্বে কুলীন বর হইলে, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী দিতে হইত। এক্ষণে স্থলবিশেষে কি কুলীন, কি মৌলিক, উভয় বরকে চুক্তি অনুসারে পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী, ঘড়ি, চেইন এবং দান সামগ্রী দেওয়া হয়। দরিদ্র ব্যক্তিরাও পণ লইয়া কন্যার বিবাহ সম্পাদন করেন না। তবে বিবাহের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য বরপক্ষ হইতে গোপনে সময়বিশেষে কন্যাপক্ষ কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শুনা যায়; কিন্তু ইহা সমাজে পণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

বিবাহের পরদিন অর্থাৎ বাসী বিবাহের দিন, "আকাটা পুকুরে স্নান" বলিয়া একটী কার্য্য আছে। এই তারিখে কন্যার বাটীতে স্বজাতীয়দিগের ভোজ দিতে হয় এবং সেই ভোজের এক পংক্তিতে বরকেও ভোজন করান হয়। ইহাকে "ঘর-ব্যবহার" বলে। বিবাহের দিন, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী-আচার ও বরণ করিবার প্রথা আছে। বাসী বিবাহের পরদিন বরকন্যা বরণ করিয়া পাঠান হয়। অর্থাৎ বিবাহ করিয়া, বর তিন দিবসের দিন সস্ত্রীক বাটী আইসেন।

ফুলশয্যার প্রথা আমাদের সমাজে নাই। বিবাহের তারিখ হইতে ৮ দিন হস্তে হরিদ্রাসূতা বাঁধা থাকে, শেষ দিনে ঐ "সূতা পুয়ান" হয় অর্থাৎ অষ্ট-মঙ্গলের কার্য্য শেষ হয়।

বরের বাটীতে বৌভাতের দিন আত্মীয় স্বজন কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এবং পংক্তি ভোজের শেষে বৌ কিছু ক্ষীর প্রথমে আত্মীয় স্বজনকে পরিবেশন করিবে, শেষে তাহার স্বামীকেও সেই পংক্তিতে ক্ষীর দিবে। ইহাকেই পাকস্পর্শ বা বৌভাত কহে।

বরকন্যা আসিবার পর অষ্টমঙ্গলার তারিখের মধ্যে—স্বগ্রামের কন্যা হইলে, তাহাকে পিত্রালয়ে আনাগোণা করাইয়া, দ্বিরাগমনের কার্য্য ধূলপায়ে লগ্নের মত করা হয়। দূরদেশ হইলে দ্বিরাগমন চন্দ্র, তারা ও শুক্র বিচারপূর্ব্বক দিন স্থির করিয়া দ্বিরাগমনের কার্য্য করিতে হয়। এই সময় কিছু মিষ্টান্ন দিয়া কন্যা পাঠান হয়।

কন্যার পিতা ক্ষমতানুসারে তাঁহার কন্যাকে বিবাহের দিন গহনা দিয়া থাকেন এবং ঐ তারিখে বরকর্ত্তা তাঁহার পুত্রবধূকে যে সকল অলঙ্কার দিবেন, তাহা জনৈক ভাই, পাত্র, আত্মীয় ও নাপিত সহ পান সুপারি দিয়া কন্যার পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

গাত্র হরিদ্রার দিন বরের গায়ে হলুদ দিয়া, উক্ত তেল হলুদ কন্যার বাটীতে পাঠান হয়। ইহার সহিত অন্য কোন দ্রব্য দিতে হয় না।

গাত্র-হরিদ্রার দিন অথবা ২।১ দিন পরে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া, একটী "আইবড় ভাতের" ভোজ দিতে হয়। তৎপরে স্বজাতিগণ বর ও কন্যাকে স্ব স্ব বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আইবড় ভাত খাওয়াইয়া থাকেন এবং লৌকিকতার স্বরূপ নগদ টাকা,কেহ বা কাপড় দিয়া থাকেন। ঐ লৌকিকতার প্রতিলৌকিকতা করিতে হয় না। যখন সেই লৌকিকতাকারীদিগের বাটীতে এই বৈবাহিক কার্য্য হয়, তখন এই লৌকিকতার ফেরত লৌকিকতা হয়, নচেৎ নয়। এমন কি দূরদেশস্থ কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ করিলে, মণিঅর্ডারে টাকা এবং ডাকে কাপড় পাঠাইতে হয়; অথবা লোক-সুযোগে পাঠান নিয়ম আছে।

আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে নিকটস্থ সমুদয় স্বজাতীয়দিগকে একাসনে অধিষ্ঠিত করাইয়া, একটী সভা করা হয়। এই সভায় বর এবং কন্যার পিতাকে অমুকের কন্যা বা অমুকের পুত্রের সহিত বিবাহ—এ বিষয় জানাইতে হয়। তৎপরে সভাস্থ স্বজাতীয়বর্গ কন্যা এবং বরকর্ত্তা কিরূপ অবস্থার লোক স্থির করিয়া, শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ জীউকে সন্দেশের বাবদে ১৬৲, ৮৲, ৪৲ এবং ২৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রণামী দিবার অনুমতি করেন; তৎপরে বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা কিরূপ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, ইহা জানিয়া সভা সেই মত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন; ধনবান হইলে ষোলআনা অর্থাৎ গোটা সমাজটীকে আহ্বান করিয়া খাওয়াইতে হয়; নচেৎ উক্ত সমাজ বা সভার নিকট অনুমতি লইয়া, মালিক, ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ এবং কুটুম্বদের মধ্যে তাহার নিকট-আত্মীয়দের লইয়া বিধি পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়। মালিক, ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ ইঁহাদের উপর উক্ত কার্য্যের ভার, ষোলআনা অর্পণ করিয়া সভার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিলে, ষোলআনা সমাজ বলা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই সকল ব্যক্তিবর্গের সবিশেষ পরিচয় পাইলাম না; আশা করি, আমাদের মেদিনীপুরস্থ দুর্গাদাস বাবু ইহার সবিশেষ তথ্য সাধারণকে জানাইবেন। মালিক, ভাই, পাত্র এবং অন্তরঙ্গ ইঁহারা কি সভা হইতে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি?

যাহা হউক, কৃতী যদি এই সকল মহোদয়ের যথোচিত সম্মান রক্ষা এবং ইঁহাদের সুপরামর্শ গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষাই হইতে হয় এবং সমাজ তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করেন। ইঁহাদের সমাজ-বন্ধন ভাবে বোধ হইতেছে,

সুনিয়মে গঠিত। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কলিকাতাস্থ অষ্টগ্রামী মহোদয়েরা ৺জগন্নাথ দেবের পূজা কলিকাতা হইতে তথায় পাঠান কি না? সহরের অধিবাসী অষ্টগ্রামীদিগের কিরূপ নিয়ম এবং আমাদের রাজা বাহাদুরের বালেশ্বরস্থ স্বজাতিবর্গ এই নিয়মে পরিচালিত হন কি না, জানিতে বাসনা হয়। আমাদের অনুমান—মালিক অর্থে অধ্যক্ষ হইবে না ত?

শ্রীশশীভূষণ সেন অষ্টগ্রামী সমাজের যে সঠিক বিবাহ পদ্ধতি লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করা গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে কোষ্ঠি গণনা প্রায়ই হইয়া থাকে। পাল্‌টি বিবাহ অর্থাৎ পরিবর্ত্ত সম্পর্ক আছে, কিন্তু অতি বিরল। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের স্বজাতীয়ের একটি সভা হয়। বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা উভয়ে স্বগ্রামের হইলে, ঐ এক সভায় কুটুম্ব মহাশয়দিগের নিকট উভয়কে আপন আপন দায় জানাইয়া, বিবাহের অনুমতি লইতে হয়। কুটুম্ব মহাশয়েরা উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কিরূপ কার্য্য করিবেন? ষোল আনা লইয়া কার্য্য করিবেন কি?" কুলীন হইলে জিজ্ঞাসা করা হয়, "ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ লইয়া কার্য্য করিবেন?" মৌলিক হইলে তাঁহাদিগকে বলা হয়, "মালিক, ভাই এবং অন্তরঙ্গ লইয়া কার্য্য করিবেন?" তাহাতে যিনি যেমন প্রার্থনা করেন, তিনি সেইরূপ অনুমতি পাইয়া থাকেন। ঐ সভায়, যাঁহারা উড়িষ্যার তাম্বূলি, তাঁহাদিগকে ক্ষমতানুসারে ২৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের সন্দেশ দাখিল করিয়া, গোষ্ঠীর অনুমতি লইতে হয়। আর বাঙ্গালার তাম্বূলী হইলে তাঁহাদের গ্রাম্য দেবতার, নিকট যেস্থানের যেরূপ প্রথা আছে, সেইরূপ দিতে হয়;—তাহাতে সক্ষম অক্ষম নাই, সব সমান; ধনী ও গরিবের পক্ষে একই নিয়ম।

অগ্রে বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া, শেষে সেই হরিদ্রা কন্যার গাত্রে দিবার জন্য, কন্যাকর্ত্তার বাটীতে লোক দ্বারা একখানি লালপেড়ে শাটী, লাল গামছা, তুয়ালে, আরসি, চিরুণী, সাবান, পাউডার, পফ্‌, সুবাসিত নারিকেল তৈল, আতর, গোলাপ, খেলানা, দধি, মৎস্য ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠাইতে হয়। অক্ষম হইলে সাধ্যমত দিলেই চলে, তাহাতে কোন কথা নাই। তাহার পর উভয়ের বাটীতে "আইবুড়া" ভাতের প্রথা আছে। তাহাও উভয়ের ক্ষমতানুসারে হইয়া থাকে।

বিবাহের দিবস উভয়ের বাটীতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ নান্দীমুখের শ্রাদ্ধ

হইয়া থাকে। ঐ শ্রাদ্ধের পরে বরকে পরামাণিকের নিকট হইতে বর-কামান কামাইতে হয়। পরে ৫ জন কিম্বা ৭ জন এয়ো স্ত্রী বরকে স্নান করাইয়া দেয়। পুনরায় আভ্যুদয়িক ক্রিয়া স্থলে আলিপনালেপিত পিঁড়ির উপর উপ-বেশন করে। ব্রাহ্মণে মন্ত্রপাঠ করিয়া বরণডালাসহ যাবদীয় বরণীয় সামগ্রী এক একটী করিয়া বরের কপালে স্পর্শ করাইয়া সেই বরণডালায় পুনঃ রাখা হয়। পরে "শ্রী" লইয়া বরের কপালে ছুঁয়াইয়া রাখিতে হয়। ঐ সময় বর-কর্ত্তা বরের হস্তে সুতা বন্ধন করিয়া দেন, এবং মস্তকে টোপর পরাইয়া দেন। পরে এয়োস্ত্রীগণ বরকে লইয়া বরণ করে এবং হাতে জাঁতি দেয়। কন্যা-কর্ত্তার বাটীতেও ঐরূপ নিয়মে কন্যার হস্তে সুতা-বন্ধন হয়। বরের বাটী হইতে সুতা যায় না। বৈকালে উভয় বাটীতে এয়োকামান অর্থাৎ নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা নাপিতানীর নিকট হইতে আল্‌তা, সিন্দুর পরে; ইহাকে এয়ো-কামান বলে। বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা আপন ক্ষমতানুসারে ঐ সকল এয়ো-দিগকে নববস্ত্রপরিধান করাইয়া, তাঁহাদিগকে দাঁড় করাইয়া, তাঁহাদের কাপড়ে পান, সুপারি, বাতাসা দেন; ইহাকে দাঁড়া-শুভচণ্ডীর পূজা বলে।

কন্যাকর্ত্তার বাটীতে ইহা ছাড়া আর একটী স্বতন্ত্র কার্য্য হয়। যত স্বামীসোহাগিনীরা মিলিয়া, একটী ছাতা মাথায় দিয়া হাইআমলা বাঁটিয়া ২৭টী গোটা পানের উপর ২৭টী বড়ি দিয়া একটী কুলার উল্টা পৃষ্ঠে রাখে। বর ছাদ্‌নাতলায় আসিলে বরণ করিবার সময় উহা আবশ্যক হয়।

নান্দীমুখশ্রাদ্ধের পর, বরকর্ত্তার বাটী হইতে কন্যা-অধিবাসের সামগ্রী পাঠাইতে হয়। বর কুলীন হইলে, অধিবাসের ডালায় কেবলমাত্র সোণার মাকড়ী দুইটী, যোড়া মাক্কই, কোলসরা, মালা, ঘুন্‌সী, সিন্দুরকৌটা এবং ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ, পরামাণিক, খেলানা, দধি, মৎস্য পাঠাইতে হয়। বর মৌলিক হইলে, অধিবাসের ডালায় এক খান সোণার অলঙ্কার, যোড়া মাক্কই, কোলসরা, ধনসোণা, কাচা সাতহাতি ও ন-হাতি সুতার শাটী, মালা, ঘুন্‌সী, সিন্দুর-কৌটা, দধি, মৎস্য, মিষ্টান্ন এবং নানাবিধ খেলানা ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, মালিক, ভাই, অন্তরঙ্গ এবং পরামাণিক পাঠান হয়। কন্যাকর্ত্তা আপন ক্ষমতা-অনুসারে ঐ সকল লোকের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহাতে কোন নিয়ম ছিল না; এক্ষণে নিয়ম হই-য়াছে। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পরামাণিক ও দাস-দাসীর স্বতন্ত্র বিদায় করা হয়। আর কুটুম্ব যত জন যাউক না কেন, মোট ২৲ টাকা সম্মান দেওয়া হয়।

সেই ২৲ টাকা অধিবাসের ডালার সহগামী কুটুম্ব মহাশয়েরা সমান অংশে অংশ করিয়া লন।

বর কুলীন হইলে, কন্যাকর্ত্তার ক্ষমতানুসারে দানসামগ্রী সভায় সাজাইয়া দেন, এবং বস্ত্রত্যাগের সময়, কন্যাকর্ত্তাকে পূর্ব্বজামাতাদিগের বরণের বস্ত্র দিতে হয়। বরের ভ্রাতার বরণের বস্ত্র দিতে হয়, পরে বরকে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণাঙ্গুরী দিয়া কন্যা দান করিতে হয়। বর মৌলিক হইলে, সূতার বস্ত্র, রূপার অঙ্গুরী ও দানসামগ্রীর মধ্যে অন্নজল ব্যতীত ইহার অধিক বিবাহ-সভায় আর কিছুই পান না। মাতুল-মানের প্রথা আছে। বর মৌলিক হইলে মাতুল-মান ১১৲ টাকা এবং কুলীন হইলে ৫৲ টাকা দিতে হয়। ইহা আমাদের পল্লীগ্রামে চলিত আছে। কলিকাতায় কেহ গ্রহণ করেন না।

প্রথমে বর বিবাহস্থলে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপাঠ ও পরে বস্ত্রত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-আচার করিতে উভয় পক্ষের পরামাণিক বরকে লইয়া ছাঁদ্‌লাতলায় আনিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া দেয়। পরে এয়োস্ত্রীগণ ২৭ কাটী অর্থাৎ ২৭টী চিত্তার কাটীর মশাল জ্বালিয়া ৫ কিম্বা ৭ জন এয়োস্ত্রীতে সাত বার বরকে পরিভ্রমণ করে। পরে ২১টি ধুতুরা ফলের প্রদীপ জ্বালিয়া বরকে বরণ করিয়া, পরে বরের মাথা ডিঙ্গাইয়া বরের পদতল গলাইয়া সেই কুলাখানি উল্টাইয়া, তাহার উপর বরণকারিণী দাঁড়াইয়া, পূর্ব্বের বাঁটা সেই হাইআমলা ২৭টার ফোঁটা সেই বামাগণ বাম হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা বরের কপালে ফোঁটা দিয়া বরের বামে ও দক্ষিণে, এবং মস্তক লজ্ঘাইয়া ফেলিয়া দেয় এবং বরণ করা হয়। পরে পরামাণিক কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাহার মুখচন্দ্রিমা পান দ্বারা আবৃত করিয়া পরামাণিকদ্বয় বরকে সাতবার পরিক্রমণ করিয়া কন্যাকে বরের সম্মুখে লইয়া "বর বড়, কি কন্যা বড়" করিয়া, উভয়ের মস্তকোপরি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, শুভদৃষ্টি করায়; মাল্যবদল, এবং পাণিগ্রহণ করাইয়া, বর-কন্যাকে বিবাহস্থলে আনাইয়া, মন্ত্রপাঠ ও কুশণ্ডিকা ইত্যাদি সমাপনানন্তর বাসরঘরে প্রবেশ করিয়া কৌড়ি ইত্যাদি খেলাইতে হয়।

তৎপরদিবস আকাটা পুকুরে স্নান। একখানি শিলের নীচে ৫খানি হরিদ্রা, ৬টা সুপারি, ৫টা হরিতকী, ৫টা বয়ড়া ও ৫ কড়া কড়ি এই পঞ্চ প্রকার সামগ্রী, এবং তাহার চারি পার্শ্বে ৪টী ছোট ছোট কলার গাছ পঞ্চসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তন্মধ্যে বর-কন্যাকে পাঁচ এয়ো মিলিত হইয়া স্নান করায়। ইহার নাম আকাটা পুকুরে স্নান, এবং বাসি বিবাহ। এই স্থানে বর বস্ত্র-

ত্যাগকালীন, মৌলিক হইলে কন্যাকর্ত্তার সহিত চুক্তি অনুসারে বরকে পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী, ঘড়ি, চেন ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রী দিয়া কন্যার মাতা-পিতা বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন; কিন্তু বিবাহস্থলে বা বাসরগৃহে সূত্র বস্ত্র, রজতাঙ্গুরী এবং অন্ন জলের অতিরিক্ত কিছুই দিতে পারেন না।

বিবাহের পরদিবস প্রাতে বরের জলখাবার বরকর্ত্তাকে পাঠাইতে হয়। ক্ষমতানুসারে নানাবিধ মিষ্টান্ন, পুরি, কচুরী ইত্যাদি এবং কন্যার আকাটা পুকুরে স্নান করিবার জন্য তৈল ও স্নান করিবার শাটী পাঠাইতে হয়। কন্যা-কর্ত্তা বরকে স্নান করিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্র বস্ত্র দেন। আকাটা পুকুরে স্নান হইয়া গেলে, বরের পরিত্যক্ত বস্ত্র কন্যাকর্ত্তার নাপিত লয়। কন্যার পরিত্যক্ত বস্ত্র বরকর্ত্তার নাপিত পায়।

বাসি বিবাহের দিন, রাত্রিতে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে একটী কুটুম্বিতা হয়। তাহার নাম বরব্যবহার বা বর-ভাত, অর্থাৎ বর কাহার সন্তান, কি বৃত্তান্ত, তাহার পরিচয় আদি লইয়া, উভয় পক্ষের সম্মানার্থে কন্যাকর্ত্তা বরপক্ষীয়দিগকে ২৲ টাকা দেন, এবং বরকর্ত্তা কন্যাপক্ষীয়দিগকে ২৲ টাকা সম্মান দেন। বর কুলীন হইলে পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাঙ্গুরী, ঘড়ি, চেন ইত্যাদি পরিধান করিয়া উভয় পক্ষীয় কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া একত্র আহার করিতে বসেন। আর বর মৌলিক হইলে তাহাকে সেই বিবাহরাত্রির প্রাপ্য সূতার বস্ত্র, রূপার অঙ্গুরী পরিধান করিয়া বাসি বিবাহের রাত্রিতে বরভাত খাইতে হয়। ইহাই আমাদিগের চিরপ্রথা, এবং সেই প্রাচীন প্রথানুসারে অদ্যাবধি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

তৃতীয় দিবসে বর-বিদায়কালীন, বরকে শয্যাতুলানী, এবং বাসরজাগরণী স্বরূপ নগদ কিছু দিতে হয়; তাহা আপন আপন ক্ষমতানুসারে। কন্যা-কর্ত্তাকে বরের বাটীতে কলসীতুলানী ও দ্বারআগলানী, (অর্থাৎ যাহাকে ননদ ক্ষেমি বা ননদপিড়ি বলে) দিতে হয়; তাহার জন্য নগদ-দক্ষিণা অবস্থানুসারে দেওয়া হয়, তাহার জন্য কোন কথা নাই।

আইবুড়া ভাতের, বা বউয়ের মুখদেখানি লৌকিকতা আমার সময় তুমি, আর তোমার সময় আমি। যেমন দেওয়া, তেমনি পাওনা। হাতে হাতে বা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত লৌকিকতা কিছুই নাই।

বিবাহের পর, তৃতীয় দিনের দিন, বর-কন্যা বাটী আসিলে বরকর্ত্তার বাটীতে একটী মৃত্তিকার ভাণ্ডে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হয়, এবং সেই দুগ্ধ উথলিয়া পড়িলে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কি হইতেছে?" কন্যা বলে, "আমার

শ্বশুরের ধন উথলিয়া পড়িতেছে।" পরে বরকন্যাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া কন্যাকে একটা থালায় অলক্তক জল করিয়া তাহার উপর দণ্ডায়মানা করিয়া, বরকন্যাকে পূর্ব্বের ন্যায় বরণ করিতে হয়। পরে একটী গৃহে উভয়কে একত্র বসাইয়া কৌড়িখেলা হয়। ঐ দিবস রাত্রিতে বরকর্ত্তার বাটীতে আমাদিগের স্বজাতীয়ের পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ থাকে। কুটুম্ব মহাশয়েরা রাত্রিতে সকলে উপস্থিত হইলে, বরকর্ত্তাকে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সূতা পোহাইবার অর্থাৎ বর-কন্যার হস্তের সূতা খুলিবার অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। অনুমতি হইলে গোষ্ঠীর তরফ হইতে জনৈক প্রধান কুলীন বাটীর ভিতর যাইয়া বর-কন্যাকে বিবাহ কালীনের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া এবং টোপর ইত্যাদি মস্তকে দিয়া বসাইতে হয়। প্রধান কুলীন মহাশয় যাইয়া একটী পাত্রে হরিদ্রা-জল করিয়া, উভয়ের হস্তের সূতা ও জাঁতি এবং কজ্জললতা লইয়া সেই হরিদ্রা-জল পাত্রে রাখিয়া দেন, ও মস্তকের টোপর নামাইয়া দেন। (হস্তে সূতাবন্ধন অষ্টাহ থাকে না।) তাহার পর পাকস্পর্শের ব্যবস্থা। কুটুম্ব মহাশয়দিগের সেবার সময় কন্যা একটী পাত্রে করিয়া ২।১ জনের পাতে পরমান্ন দিয়া, অবশেষে বরকে সেই পাত্র সমেত দিয়া যায়। ইহারই নাম পাকস্পর্শ।

ফুলশয্যার ব্যবস্থা কলিকাতায় আছে, পল্লীগ্রামে নাই। ফুলশয্যার দিন কন্যাকর্ত্তা, বরের জন্য সূতার ধূতি, উড়ানি, এবং কন্যার জন্য লালপেড়ে শাটী, ফুল, চন্দন, আতর, গোলাপ, নানাবিধ সৌগন্ধদ্রব্য, এবং বিবাহ-দিবসের দান-সামগ্রী, খেলানা, আরসি, চিরুণী, ব্রুশ ও বরকর্ত্তার বাটী হইতে গাত্র-হরিদ্রা এবং অধিবাসের যে সকল উপঢৌকন পাঠান হইয়াছিল, কেবল তৈল-হরিদ্রা ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য ফুলশয্যার সঙ্গে ফেরত পাঠাইয়া দেন। ইহা ব্যতীত ক্ষমতানুসারে নানাবিধ মিষ্টান্ন পাঠাইতে হয়। পল্লীগ্রামে এ ব্যবস্থা নাই। তথায় আছে মেলানিভার। বিবাহের পর, কন্যাকর্ত্তা তাঁহার কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিতে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া ক্ষমতানুসারে চিঁড়া, মুড়কি, বাতাসা, দধি ও নাড়ু বরকর্ত্তাকে দিয়া কন্যা লইয়া আসেন। ইহাকে পল্লীগ্রামে মেলানিভার কহে।

স্বগ্রামের মধ্যে হইলে, সূতা পোহাইবার পর কন্যা শ্বশুরালয় হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া, পিত্রালয়ে যায়। তথায় মিষ্টান্নগুলি রাখিয়া পিত্রালয় হইতে কিঞ্চিৎ ইন্দুরমাটি এবং মিষ্টান্ন লইয়া পুনরাগমন করে। ইহাকে "ধূলাপায়ে লগ্ন" বলে। দূরদেশ হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা-নক্ষত্রের বিচার করিয়া আনিতে হয়।

কন্যাদানকালে সকল জাতিকেই, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাক ও অপরাপর এবং স্বজাতির অনুমতি লইয়া কন্যাদান করিতে হয়, ইহা লেখা বাহুল্য বিবেচনায়, আমি লিখিলাম না।

পরিত্যক্ত বিষয়গুলি নিম্নে লিখিলাম।

বরণডালা অর্থাৎ একখানি থালায় ধান, দূর্ব্বা, একটি ছোট মুড়ি, নারিকেল, পঞ্চশস্য, শঙ্খ, ছোট চামর, এক ছড়া আথও কাঁঠালি কলা সাজান থাকে এবং স্বতন্ত্র নূতন কুলায় একখানি হরিদ্রা রঙ্গের গামছা ঢাকা ৪টি ছোট হাঁড়ি, খুব ছোট মাটির ভাঁড়ের মত, তাহাকে আকহাঁড়ি বলে, তাহার আবার সরার মত ৪ খানি ঢাকনি আছে। সেই ৪টি হাঁড়িতে হরিদ্রা মাখান চাউল, ৫ খানি গোটা হরিদ্রা, ৫টি হরিতকী, ৫টি বয়ড়া, ৫ কড়া কড়ি এই পঞ্চ প্রকার দ্রব্য থাকে।

বাসর গৃহে বর-কন্যার কড়িখেলার পর, সেই কুলাখানি লইয়া বরের সম্মুখে রাখিয়া, সেই আখহাঁড়ির চাউলগুলি কুলায় ঢালিয়া দেয়, এবং স্বর্ণরজ্জু দিয়া কন্যার হস্তবেষ্টন করিয়া দিতে হয়।* পরে কন্যা সেই চাউলগুলি দুই হস্তে অঞ্জলী করিয়া লইয়া সেই ৪টি হাঁড়ি পূর্ণ করে। পরে বর সেই ঢাকনি ৪ খানি লইয়া কন্যার নাম বলিয়া—যথা অমুকের লজ্জা সরমে ঢাকা পড়িল, বলিয়া একে একে ৪টি হাঁড়িতে ঢাকা দেয়। ইহাকে আখহাঁড়িও বলে এবং মঙ্গলা হাঁড়িও বলে। এই সকল প্রথা আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজে চলিত।

আমাদিগের স্বজাতিকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা নাই। কৃতিকে প্রতিদিন কুটুম্ব মহাশয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়; এমন কি যদি কোন কৃতি মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন দুইবেলা সেবা লইতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে দুইবেলা দুইবার নিমন্ত্রণ করিতে আসিতে হয়। এ নিয়ম কেবল কলিকাতায় প্রচলিত নাই। পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই আছে।

কলিকাতা সহরের অধিবাসীদিগের যেরূপ নিয়ম ও বিবাহ-পদ্ধতি, তাহা লিখিলাম, আপনি দয়া করিয়া মুদ্রিত করিয়া অষ্টগ্রামী সমাজকে বাধিত করিবেন।

অন্য কিছু জানিবার ইচ্ছা হইলে, পত্রদ্বারা জ্ঞাত করাইবেন। কৃতসাধ্য মত মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করাইতে ত্রুটি করিব না।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রক্ষিত ২য় পত্রে লিখিতেছেন।

* স্বর্ণরজ্জু অর্থাৎ একছড়া রেশমের হার দিয়া হস্ত বেষ্টন করার নাম স্বর্ণরজ্জু।

সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন। পরে আমি ইতিপূর্ব্বে "তাম্বূলি অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতি" যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কতক অসম্পূর্ণ থাকায়, অদ্য নিম্নে আরও লিখিলাম।

১। বিবাহের তারিখে বরের বাটী হইতে কন্যার বাটীতে অধিবাস যাইলে, যাঁহারা অধিবাসের ডালার সহিত যান, তাঁহারা কন্যার বাটী হইতে "সমুদ্র বিদাই" বাবত ২৷১টী মুদ্রা সম্মান বাবত পাইয়া থাকেন।

২। বিবাহের তারিখে বর সভাস্থ হইলে বরকর্ত্তাকে গ্রাম্য বাব ইত্যাদি ও ঢেলামারার বাবত কিছু দিতে হয়।

৩। বিবাহের সময় সভা-বরণ পান-গুপারি দ্বারা ও গুরু-বরণ, পুরোহিত-বরণ, গ্রাম্য দেবতাদি-বরণ ইত্যাদি বরণও পান গুপারি দ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। আর কন্যাকর্ত্তাকে তাঁহার পূর্ব্ব জামাতাগণের মান্য স্বরূপ অবস্থানুসারে ধুতি উড়ানি বস্ত্রাদি দিয়া বরণ করিতে হয়। মাতুল মান, মাতামহীর মান ইত্যাদি বরকর্ত্তাকে দিতে হয়। বিবাহের রাত্রিতে বাসর-জাগানি হয় এবং তৎপরদিন শয্যা তুলা হয়, তৎ বাবৎ বরকে "বাসর-জাগানি" ও "শয্যা তুলানী" কিছু দিতে হয়।

৪। কন্যা দ্বিরাগমন কালীন শ্বশুরালয় যাইলে তৎসঙ্গে একটী মেলানি-ভার দিতে হয় অর্থাৎ তাহাতে অবস্থানুসারে যথোপযুক্ত মিষ্টান্ন ও নানাবিধ দ্রব্যাদি ও কন্যার কাপড়াদি বা শয্যাদি এবং বরের বাড়ীর গুরুজন ব্যক্তিকে নমস্কারী কাপড় চোপড় দিতে হয়।

৫। বিবাহের পর প্রথমতঃ জামাতা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে টাকা দিয়া জামাতা প্রণাম করিবে। পরে জামাতা প্রত্যাগমন কালীন নগদ টাকা ও বস্ত্রাদি উক্ত গুরুজনের নিকট হইতে সম্মান স্বরূপ লৌকিকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৬। গহনা বা পণ কিছু নির্দ্ধারিত নাই। উভয় পক্ষের অবস্থা ও ইচ্ছানুসারে কন্যাকে অলঙ্কার দেওয়া হয়।

৭। "আর অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ-পদ্ধতির" ১১ দফা অনুসারে একাসন করিয়া শুভাশুভ কার্য্য শেষ করিতে হয়। বিদেশস্থ কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, "জানান এক পণ কড়ি" দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল। শুনা যায়, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ৫ একটী পয়সা উক্ত একপণ কড়ির পরিবর্ত্তে ঝিউরী জানান ইত্যাদি মান্য দিতে হয় এবং তাঁহার বাটীতে কোন দেবতা থাকিলে

তাঁহার বাবত পৃথক ৫ পয়সা মান্য দিতে হয়। ঐ সকল মান্য দিয়া নিমন্ত্রণ করা হয়। এইরূপ করিলে তবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু স্বদেশে বিবাহ আদির নিমন্ত্রণ হইলে ঐ নিয়ম খাটে না। সেস্থলে উক্ত নিমন্ত্রণ জন্য মান্য সন্দেশ বাবত ৺জগন্নাথ জীউকে অর্পণ করা হইয়াছে, এরূপ ধরিয়া লওয়া হয় বলিয়াই স্বদেশের নিমন্ত্রণে কড়ির পৃথক্ ব্যবস্থা নাই। বিদেশে লোকাভাবে ডাকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হইলে দেবতার মান্য ও ঝিউড়ি জানানাদি কড়ি বাবত টিকিট উক্ত পত্র মধ্যে পাঠান হয়।

৮। উক্ত "অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির" ১২ দফায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও বালেশ্বর অষ্টগ্রামী সমাজ "মেদিনীপুর স্থানের ৺জগন্নাথ জীউকে" পূজা পাঠান সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়মে পরিচালিত হন কিনা? তৎসম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইল।

৯। আমাদের স্বস্থান অর্থাৎ মেদিনীপুর অষ্টগ্রামী সমাজের সন্দেশ বাবত কড়ির টাকা মেদিনীপুর ৺জগন্নাথ জীউকে দেওয়া হয়। ঐরূপ কলিকাতাস্থ ও বালেশ্বর স্থানের অষ্টগ্রামী তাম্বূলি মহাশয়গণও মেদিনীপুর স্থানের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানের সন্দেশের টাকা এই মেদিনীপুর স্থানের ৺জগন্নাথ জীউকে অর্পণ করেন। ইহা বহুকাল হইতে এইরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। আর উক্ত "অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির" ১১ দফায় লিখিত ১৬৲ ৮৲ ৪৲ ২৲ টাকা (অবস্থানুসারে) সন্দেশ বাবত কৃতির নিকট লইয়া সকল স্থানেই কার্য্যের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত সমস্ত টাকা মেদিনীপুর স্থানের ৺জগন্নাথ জীউর বাবত ষোল আনা, অষ্টগ্রামীর তরফ একজন খাজাঞ্চির নিকট খাতায় জমা হইয়া থাকে।

১০। মহাশয় "মালিক আদির অর্থ কি?" জানিতে চাহিয়াছেন। তাহা নিম্নে লিখিত হইল। "স্থান বা থান, দল, ভাই, পাত্র, আত্ম, অন্তরঙ্গ, দশ গ্রামের দশ জনা" বেষ্টিত মহাশয়েরা সকলেই উপস্থিত। দশের অনুমতি হইলে কৃতি কার্য্যের জন্য অনুমতি পায়। ইত্যাদি বচনটী একজন কুলীনের দ্বারা ব্যক্ত হইবে। তদনুসারে কৃতি অনুমতি পাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। প্রথমতঃ ১০টী গ্রাম লইয়া প্রথমে অষ্টগ্রামী সমাজ গঠিত হয়। তজ্জন্যই দশ গ্রামের নাম এ পর্য্যন্ত খ্যাত আছে। উক্ত দশটী গ্রামের নাম ধরিয়া কোন মাসের কোন সংখ্যার কোন বৎসরে ১০টী কুলীন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহা "মহাজন বন্ধু" নামক মাসিক পত্রিকায় ১০।১১ পৃষ্ঠায় (উপাধি ও মন্তব্য) স্থানে উদ্ধৃত হই-

য়াছে, তন্মধ্যে "পোল ও পাত্বূল" এই দুই গ্রাম ফৌৎ অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অবশিষ্ট ৮টী গ্রাম মাত্র বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান আছে।

১১। "মালিক" শব্দে মৌলিকের যিনি কুলীন, তাঁহাকেই বুঝা যায়। কুলীন না হইলে শুভাশুভ কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় না। কুলীনের পাত্রের বাড়ীতে কোন শুভাশুভ কার্য্য উপস্থিত হইলে উক্ত মালিকের বাটীতে কুলীনের নিকট যে ডালা পড়িবে, তাহাতে যে টাকা ও পান শুপারি ইত্যাদি দেওয়া হয়, তাহা মান্যস্বরূপ কুলীনেই গ্রহণ করিবেন। আর যে কুলীনের পাত্র নাই, তিনি একানি-অংশী ভাই। কোন কুলীনের বাটীতে কোন কার্য্যকলাপ উপস্থিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা অর্থাৎ কুলীনগণের মধ্যে যিনি উক্ত একাসনে উপস্থিত থাকিবেন, তিনিই উপরোক্ত বচনটী ব্যক্ত করিবেন। কুলীনের ঘরের কার্য্যে ডালায় ২৫৲ টাকা দেওয়া হয়। তাহা কুলীনের ভাণ্ডারে যাইবে অর্থাৎ কুলীনের নিজ ঘরেই থাকিবে; উক্ত ডালার টাকা অন্য কেহ পাইবেন না।

১২। অষ্টগ্রামী সমাজের শুভাশুভ কার্য্যে কুটুম্বিতায় একটী কাগজের প্রথা আছে। উক্ত কাগজে অগ্রে সারদে, বামনদে, হেলান মল্লিক, সেব্যরাজসেন, সেনপুরের সেন, কুশমাথা গুঁই, বড়গ্রামের লাহা ইত্যাদি পর পর কুলীনের নাম লিখিতে হইবে। বাগড়ার নন্দীর নাম কুটুম্বিতার কাগজের সহিত লিখিত হয় না। উক্ত আমদানী টাকা মোড়কে করিয়া পৃথক রাখা হয়। আর মৌলিক পাত্রগণের নাম লিখিত হইবার পূর্ব্বে "মজকুরি-আশের" নাম কাগজে আড়ভাবে লিখিতে হইবে। তৎপরে উপরোক্ত কুলীনগণের পরের পর যেমত কাগজে নাম লিখিত হয়, তদনুসারে উক্ত কুলীনগণের পাত্রের নাম অর্থাৎ মৌলিকের নামগুলিও লিখিত হয়।

১৩। শুভ বিবাহ আদিতে সভাস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখগণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে ব্রাহ্মণ, তৎপরে কায়স্থ ও নবশাখগণকে মালা-চন্দন ব্রাহ্মণের দ্বারা বিতরণ করিয়া, পরে স্বজাতি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারদে, বামনদে, হেলান মল্লিক ইত্যাদি যাবতীয় কুলীন মৌলিকগণকে ক্রমানুসারে পরের পর মালা চন্দন দেওয়া হয়। কুলীনের অনুমতি না হইলে কৃতির কার্য্য সম্পন্ন হইবে না।

১৪। ভাদ্র মাসের মাসিক পত্রিকায় "অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির" ১১ দফায় লিখিত ভাই, পাত্র এবং অন্তরঙ্গ—ইহারা কি সভা হইতে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, অথবা কিরূপ? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। উত্তরে বলি-

তেছি যে, কৃতি অবস্থাপন্ন হইলে তাহার শুভাশুভ কার্য্য উপলক্ষে যে কয়েক দিন কার্য্য করিবেন, তাহাতে ষোল আনাকে উক্ত কয়েক দিন কার্য্য উপলক্ষে ডাক ও নিমন্ত্রণ অর্থাৎ ষোল আনাকে আহ্বান করিয়া সমবেত করিতে হইবে। উক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে কেবল ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ দ্বারা উক্ত কার্য্য সারা চলিবে না। তবে কৃতি অবস্থাহীন হইলে, উক্ত কৃতি প্রথমে যে একটি একাসন আহ্বান করিবেন, সেই একাসনের উপস্থিত ষোল আনা কৃতিকে অবস্থাপন্ন যগুপি বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে অত্র পত্রের ১০ দফায় লিখিত কুলীন ও অন্তরঙ্গ ও ভাই, পাত্র ইত্যাদির মধ্য হইতে এক এক জনা বা প্রত্যেককে লইয়া কৃতি কার্য্য করিতে পাইবেন। এমত ষোল আনা বিবেচনা করিলে এই মত আদেশ দিয়া থাকেন; তদনুসারে কৃতির কার্য্য সমাধা হয়। অর্থাৎ উক্ত দশ দফায় লিখিত ব্যক্তিগণের উপর উক্ত সময়ের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ক্ষমতা ষোল আনা দিয়া থাকেন। তাহাতে চিরস্থায়ী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে ধারণা করিবেন না। কেবল উক্ত কৃতির ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্যই দেওয়া হইয়া থাকে।

চতুর্গ্রামী সমাজের বিবাহ।

মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দে মহাশয় লিখিয়াছেন।

আমাদের সমাজে বিবাহে কৌলীন্য-প্রথা পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই; বরং মালিক-প্রথা আছে; কিন্তু তাঁহাদের সম্মানার্থ নগদ মুদ্রাদি কিছুই দিতে হয় না। তবে যদি বরকর্ত্তার পিতা মালিক হন, তাহা হইলে, ধনসোনা স্বরূপ ১৷৶০ কন্যাকর্ত্তাকে দিতে হয়।

বর সভাস্থ হইলে, পান সুপারি দেওয়া হয়। উহা দ্বারা সভা-বরণ হয়। এই পান সুপারির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; পান পান না পান না পান। বিবাহের পূর্ব্বে গুরু পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ তৎপরে স্বজাতি ও সভাস্থ অন্যান্য লোকের অনুমতি লইয়া বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব জামাতাদিগের বরণ অগ্রে দিতে হয়, তৎপরে মাতুল সম্মান ও মাতামহীর সম্মান দিতে হয়। বিবাহের পর দিন "আকাটা সিনান" করান হয়। ইহা ভিন্ন বিবাহের পর দিন অন্য কোন প্রথা প্রচলিত নাই। অবস্থানুসারে বরকে পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে সূতার কাপড় দেওয়া হয়; ফুলশয্যা আছে, ক্ষমতানুসারে দেওয়া হয়।

বিবাহরাত্রে কন্যার বাটীতে যে যজ্ঞ করিয়া বরযাত্রী খাওয়ান হয়, এই বর-

যাত্রীর ভোজন দক্ষিণা কিছু কিছু দিতে হয় ;—ইহাকেই "সুকৃতি ভোজন" বলে এবং এই যজ্ঞের অনুমতি কুটুম্ব মহাশয়গণের নিকট হইতে পূর্ব্বেই লইতে হয়।

বিবাহের পর বর বাটীতে পৌছিলে, বরকর্ত্তা গ্রামস্থ স্বজাতির একটা ভোজ দিয়া থাকেন ; কন্যার পিত্রালয় বরের স্বগ্রামে হইলে, এই সঙ্গে কন্যার আত্মীয়গণকেও নিমন্ত্রণ করা হয়, ইহাই বৌভাত।

বিবাহের তৃতীয় দিবসে বরকন্যা নিজালয়ে আসিয়া, আটদিনের দিন অষ্ট-মঙ্গলা শেষ করেন।

নমস্কারী কাপড় দ্বিরাগমনের সময় দিতে হয়। বৎসরান্তে দ্বিরাগমনের নিয়ম ; কিন্তু মেয়ে বড় হইলে, ধুল পায়ে লগ্ন করা হয়।

বিবাহের পর সর্ব্ব প্রথম বর শ্বশুর বাটী আসিলে, শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতিকে টাকা দিয়া প্রণাম করিতে হয়। সেই প্রণামী টাকা তাঁহারা ফেরত দিয়া, তৎসঙ্গে আরও লৌকিকতা করেন।

গহনা বা পণের কোনরূপ পীড়াপীড়ি নিয়ম বা দর দস্তর করা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ। অবস্থানুসারে গহনা দেওয়া হয়।

অগ্রে কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দিতে হয় ; কিন্তু বরের বাটী হইতে লগ্নধরণী হরিদ্রা সিন্দুরাদি পাঠাইতে হয়। বিবাহের নিমন্ত্রণ সর্ব্ব সাধারণকে করা হয় ; এবং সকলেই লৌকিকতা দিয়া থাকেন।

দরিদ্রেরা কন্যা বিক্রয় করিয়া পণ লইয়া থাকে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বে ছিল না।

বিবাহের পূর্ব্বে জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং মালিক একাসন করিয়া, উঁহাদের সম্মান স্বরূপ ১৲ টাকা ও পান সুপারি দিয়া বিবাহের অনুমতি লইতে হয়। পূর্ব্বে টাকার পরিবর্ত্তে কড়ির ব্যবস্থা ছিল। এখন তাহা নাই, এখন ১৲ টাকা হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত লওয়া হয়। এই টাকা সভায় দিলে দেশ বিদেশ সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইল এবং বিবাহের সমাচার, পত্র দ্বারা দেওয়া হয়।

বিবাহের পর কন্যা লইতে আসিলে মেলানী-ভার ও কল্যাণীয় লাড় দিতে হয়। ছাঁদলাতলার খরচা কন্যাকর্ত্তাকে দিতে হয়, পণে বিবাহ হইলে বরকর্ত্তা দিয়া থাকেন। পীতাম্বরবাবু দ্বিতীয়বার লিখিয়াছেন ;—

যদ্যপি উভয় পক্ষের মালিকের সহিত বিবাহ হয়, তবে ধনসোনা স্বরূপ ১৷৵৹ আনা কাহাকেও দিতে হয় না। বিবাহের পরদিবস কন্যার বাটীতে যজ্ঞ হয়। ঐ যজ্ঞকেই সুকৃতিভোজন বলে। দিবাভাগে ও রাত্রিতে যজ্ঞ হয়। এক্ষণে বরযাত্রীর সুবিধার জন্য দিবাভাগে যজ্ঞ ও রাত্রিতে জলপান হয়। কার্য্য সমাধা

হইলে মালিক এবং পাত্রকে ১৲ টাকা অথবা ॥৹ আনা মানস্বরূপ বিদায় উভয়কেই করিতে হয়। সেই বিদায় উহারা উভয়ে ॥৵৹ আনা ও ।৵৹ আনা ভাগ করিয়া লয়। কার্য্য সমাধা হইলে ডালাবিদায় করা প্রচলিত আছে। ঐ ডালা ৪ খানা কুতির বাটি হইতে বাহির হয়; ঐ ডালা দে, কুণ্ডু, সেন, গণ ইঁহারা পাইয়া থাকেন। ডালার নিয়ম ৬ পণ ১৫ গণ্ডা করিয়া কড়ির দুইখানি ডালা বাহির হয়; একখানি সেনপুরের দায় দিয়া, আর একখানি বিষ্ণুপুরের দায় দিয়া বাহির হয়, আর একটি ডালা এক কাহন পাতুলসাঁতার দায় দিয়া বাহির হয়, আর একটি ডালা ৪ পণ ১০ গণ্ডা দেপুরের দায় দিয়া বাহির হয়। এই ৪খানি ডালার মধ্যে দেয়ার দে কপিলর্ষি গোত্র হইলেই ঐ ডালা গ্রহণ করিবেন। ইহাকে গৌরবের ডালা কহে। অপর দে হইলে ইহা পাইবেন না। আর বিষ্ণুপুরেরটী কুণ্ডু পাইবেন, সেনপুরেরটী সেন পাইবেন, পাঁতুল সাঁতারটী গণ পাইবেন। এই ৪টী ডালার মধ্যে ঐ মালিকগণের বাটীতে ক্রিয়াকল্প হইলে সেই ডালাখানি ভাঁড়ারগত হইবে, ও বাকি ৩খানি ডালা বিলি হইবে। বরের তৃতীয় দিবসে বাটী আসিবার সময় বরকর্ত্তার বিদায় ১৲ টাকা ও নিতবরের বিদায় ॥৹ আনা, আর বরযাত্রীর বিদায় কেহ২ গায়ে২ করিয়া থাকেন, কেহ বা ক্ষমতা অনুসারে দিয়া থাকেন। আর একটী কথা, কন্যার বাটীতে বিবাহের রাত্রিতে কন্যার ভগিনীরা বাসর জাগান ও তাহার পরদিবস আকাটা স্নানের পর দুধপান্ত ও কড়িখেলা চিরপ্রথা আছে। এবং ঐ দুধপান্তর উচ্ছিষ্ট-তোলা কন্যার ভগিনীরা মান্য স্বরূপ কিছু পাইয়া থাকেন, তাহা বরকর্ত্তাকে দিতে হয়। বর ও কন্যা বাটীতে পৌছিলে কলসী তুলান ও দুয়ার আগুলা হিসাবে বরের ভগিনীদিগকে মান্য স্বরূপ কন্যার পিতাকে অবস্থানুসারে দিতে হয়। বিবাহের রাত্রিতে বরকর্ত্তাকে কন্যার ভ্রাতৃবর্গের মান্য স্বরূপ ২৲ টাকা দিতে হয়। বর বিদায় কালীন ২৲ টাকা কন্যাকর্ত্তাকে বরের ভ্রাতৃবর্গের বিদায় স্বরূপ দিতে হয়। কেহ কেহ গায়ে গায়ে শোধ করিয়া দেন।

সপ্তগ্রামী সমাজের বিবাহ।

নান্দিবৃদ্ধি হইয়া অধিবাস হয়। তৎপরে বরের বাটী হইতে হলুদবাটা এবং হরিদ্রাসূতা, দূর্ব্বা, সন্দেশ, বাতাসা, গোটা পান ও সুপারি কিছু কিছু লইয়া জনকয়েক সধবা স্ত্রীলোক এই সকল দ্রব্য ক'নের বাটী লইয়া যান ও লগ্ন মতে

তথায় ক’নের গায়ে এই হলুদ দিয়া হস্তে জাঁতি দেওয়া হয়। এবং পান, সুপারি, সন্দেশ, বাতাসা নিমন্ত্রিত সধবা স্ত্রীলোকদিগকে তথায় বিতরণ করা হয়। ক’নের গায়ে হলুদ দিবার সময় ৫ খাই হরিদ্রাসূতা ৫টী দূর্ব্বা সহ উহার বাম হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে ক’নের বাটী হইতে উক্ত তেল হলুদ এবং উহার সঙ্গে তাঁহারা আবার পান, সুপারি, সন্দেশ, বাতাসা দিয়া, সেই সকল সধবা স্ত্রীলোকের দ্বারা বরের বাটী পাঠাইয়া দেন। এইবার বরের হাতে ৫টী দূর্ব্বাসহ ৫খাই হরিদ্রাসূতা এবং হস্তে দর্পণ দেওয়া হয়। সন্দেশ বাতাসা বা পান সুপারি দিবার কোন পরিমাণ নাই; অল্পই দেওয়া হয়। নববস্ত্র পরিধান করিয়া গায়ে হলুদ হয়, কিন্তু তাহা নিজে দের। উহা কাহারও প্রদত্ত নহে।

বিবাহের ২।৪ দিন পূর্ব্বেও গায়ে হলুদ হয়। অথবা কল্য বিবাহ অদ্যও গায়ে হলুদ হয়। সম্বন্ধের পরে কোষ্ঠি গণনা প্রায়ই হয়। পাল্‌টি বিবাহ, অর্থাৎ দুই-জনেরই ছেলে মেয়ে পরস্পরে বিবাহ হয়। কিন্তু তাহা অতি বিরল। গায়ে হলুদের পর বর ও কন্যার নিকট আত্মীয়েরা স্ব স্ব বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমান্ন ভোজন করান এবং নববস্ত্র দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, ইহাকেই “আইবুড়া ভাত” বলে। দূর সম্পর্কে যে সকল স্বজাতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাঁহারা সকলেই বস্ত্র এবং কিছু মিষ্টান্ন বা দুধ দিয়া লৌকিকতা করেন। বরের বাটীতে এই লৌকিকতায় ধুতি চাদর, ক’নের বাটী নিমন্ত্রণ হইলে সাটী কাপড় দিতে হয়। নিমন্ত্রণ না হইলে কোন তত্ত্ব করিতে হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের কোন সভা সমিতি বা মালিককে জানাইতে হয় না, তবে সমাজের পূজনীয় মহোদয়দিগকে জানাইয়া “অধ্যক্ষ” করা হয়। কিন্তু নিমন্ত্রণ ইচ্ছা কিম্বা অবস্থানুসারে করা হয়। তাহাতে কাহারও মান অভিমান নাই। সাধারণের নিকট যে বস্ত্র লৌকিকতা পাওয়া যায়, তাহা আবার তাঁহাদের বাটীতে কাহা-রও বিবাহের সময় এই লৌকতার পুনঃপ্রদান হয়। নচেৎ নহে।

বিবাহের দিন বর এবং ক’নের বাটী ছাঁদলাতলা হয়। দুইজন লোক দাঁড়াইতে পারে এমন একটু বাটীর ভিতরের উঠানে অথবা কোন স্থানে ৪টি “কলার তেড়” অর্থাৎ ক্ষুদ্র কলাগাছ চারিকোণে রাখা হয়; ইহাকেই ছাঁদলা-তলা বলে। বরের বাড়ীর ছাঁদলাতলার ভিতর শিল ও পাথর এবং ক’নের বাড়ীর ছাঁদলাতলায় একখানি শিল ও আলিপণাযুক্ত পিঁড়ি রাখা হয়।

বিবাহের দিন “জল সওয়া” হয়, তৎপরে বৈকাল বেলা নাপিত আসিয়া বরকে কামাইয়া দেয়। এ সময় বরের পরিধেয় যে বস্ত্র থাকে, তাহা নাপিতের

প্রাপ্য। বর কামাইয়া ছাঁদলাতলায় স্নান করে; পরে কয়েকজন সধবা স্ত্রীলোকে ইহার হস্তে ৭ থাই হরিদ্রাসূতা বাঁধিয়া দিয়া, বরণডালা এবং শ্রী দিয়া বরণ করে।

"শ্রী" ব্রাহ্মণের সধবা স্ত্রীলোকে প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহা চাউল বাটায় বিবিধ রং দিয়া পর্ব্বতের মত করা হয়। এই পর্ব্বতের গাত্রে বৃক্ষলতাদি করিয়া শিল্প দেখান হয়।

বরণডালা অর্থাৎ একখানি থালায় ধান, দূর্ব্বা এবং ৪টি মাটির চোরো থাকে। মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত খুব ক্ষুদ্র হাঁড়ির মত আকৃতি দ্রব্যকে "চোরো" বলা হয়। ইহার আবার ঢাক্‌নী আছে। কোন চোরোয় হলুদ মাখা চাউল, কোনটিতে পান বা সুপারি আদি থাকে। এই চোরোগুলিও থালার উপর বসান থাকে, ইহাকে বরণডালা বলে। বরণের পর "সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে" প্রভৃতি যাত্রার মন্ত্র পাঠ করা হয়। ওদিকে মেয়ের বাটীর ছাঁদলাতলায়ও ঐ ব্যাপার। তথায় নাপতিনী দ্বারা ক'নে নখ কাটিয়া আল্‌তা পরিয়া, পরিণয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েন। এ সমাজে ৮।১০ এবং ১২ বৎসরের মধ্যেই কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। এখানেও ছাঁদলাতলায় ক'নেকে ঐরূপ ডালা দিয়া, সধবা স্ত্রীলোকে বরণ করে।

সভায় ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতির অনুমতি লইয়া কন্যাদান করা হয়। সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ করার পর বর ছাঁদলাতলায় যায়। তথায় স্ত্রী-আচার অর্থাৎ শুভদৃষ্টি হয়। তৎপরে বর ও ক'নেকে পুনরায় সভাস্থ করা হয়। এখানে প্রতিজ্ঞামন্ত্রের ও সাক্ষিমন্ত্রের পাঠ এবং শুভদৃষ্টি করিয়া কুশণ্ডিকার পর বিবাহ সমাপ্ত হয়।

তাহার পর বাসর ঘর। পরদিন বৈকালে বরকর্ত্তা যে গহনা পাঠাইয়া থাকেন, তাহা পরাইয়া ছাঁদলাতলায় আবার ক'নে ও বরের হস্তে ৭ থাই সূতা বাঁধিয়া বরণ করিয়া বর ক'নেকে পাঠান হয়। ইহাকেই বাসী বিবাহ বলে।

বরযাত্রী ভোজনের পর কন্যা এবং বরের উভয়ের বাটীর পান সুপারি স্বজাতিবর্গকে দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কুলীনদিগকে ডালা দেওয়া হইত, এখন তাহা হয় না; ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা বরকর্ত্তা যাহা দিবেন, কন্যাকর্ত্তা উহার অর্দ্ধেক দিবেন,—ইহাই প্রচলিত প্রথা।

বর ও ক'নে বাটী আসিলে, তাঁহাদের বরণ করিয়া লওয়া হয়। এবং কড়ি-খেলা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দ্বিরাগমন হয়। শ্বশুর-বাটী নিকটবর্ত্তী হইলে, তথায় নচেৎ জ্ঞাতির বাটী গমনাগমন করাইয়া কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া, দ্বিরাগমন শেষ করা হয়। বিবাহের পরদিন ফুলশয্যার বিবিধ দ্রব্যাদি রীতিমত ভাবে

দেওয়া হয়। দূরদেশ হইলে, টাকা ধরিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের রাত্রিতে সভায় দান সামগ্রী সাজাইয়া দেওয়া হয়। গহনা বা অন্য কোন দান সামগ্রী দিবার চুক্তি নাই। বরের বা ক'নের পণ নাই। এ সকল প্রথা এ সমাজে ঘৃণার্হ।

বিবাহের পর উভয় পক্ষেই নূতন কুটুম্ব ভোজন বলিয়া যজ্ঞ করেন। পাক-স্পর্শে পংক্তি-ভোজনের শেষে ক'নে আসিয়া ২।১০ পাতে পরমান্ন পরিবেশন করেন ; ক'নের বাটীতে বাসী বিবাহের দিন বরকে পংক্তি-ভোজনে বসিতে হয়।

হরিদ্রা কাপড় পরিবর্ত্তনের পর বর জোড়ে আসিয়া শ্বশুর-বাটী ৮ দিন থাকেন ;—ইহাই নিয়ম। এই সময় বর শ্বশুর-বাটীর গুরুতর সম্পর্কীয় জন-গণকে টাকা দিয়া নমস্কার করেন।

বরের বাটীতে ক'নে দেখার দিন ক'নে তাহার মান্য গুরুতর ব্যক্তিবর্গকে যথাসম্ভব ধুতি, চাদর, সাটি, থান দিয়া নমস্কার করে। সধবার সাটি, বিধবার থান কাপড়, পুরুষগণের ধুতি চাদর নমস্কারীরূপে প্রদান ও নমস্কার করা প্রথাসম্মত। ধনবান্ আত্মীয়েরা এই দিন গহনা দিয়া থাকেন ;—সাধারণে টাকা দিয়া বৌ'র মুখ দেখেন।

বিবাহের পূর্ব্বে কোষ্ঠি গণনা করিয়া,ছেলে এবং মেয়েকে টাকা বা অলঙ্কার দিয়া "বাগ্‌দত্ত" করা হয়।

ঘড়ি চেইন এবং রূপার বাসন ইচ্ছানুসারে বড়লোকেরা দিয়া থাকেন।

মাতুল বরণ নাই। কিন্তু দান সামগ্রীর সঙ্গে ভোদোর লাড়ু ১০০ শত ন্যূনা-ধিক্য পরিমাণে দেওয়া হয় ; এই সঙ্গে শ্বাশুড়ী এবং ননদের লাড়ু সম্মান-স্বরূপ কিছু নূতন আকৃতিতে বড় করিয়া দেওয়া হয়। ননদের লাড়ু ভিন্ন দর্পণ, চিরুণী, কাপড়, সিন্দূর-চুবড়ী ইত্যাদি প্রাপ্য আছে।

বিবাহ-বাসরান্তে "বরের শয্যাতুলা" বলিয়া চাওয়া হয় ; কিন্তু টাকা লাগে না। এ প্রথা ক্রমেই মৃতাবস্থায় পতিত—তাই জোর নাই। বর যে টাকা দিয়া নমস্কার করেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপ্রদান করিয়া লৌকিকতা করিবার রীতি নাই। বরযাত্রীর রাহাখরচ বর-পক্ষকে দিতে হয়। সুকৃতি-ভোজন আছে, কিন্তু স্বজাতীয় বরযাত্রীর দক্ষিণা দিবার প্রথা নাই। ইহাদের ভাগিনেয়ের বরণ নাই ; আইবুড়া ভাতের লৌকিকতা অষ্টগ্রামী সমাজের অনুরূপ।

পল্লী সমাজের বিবাহ।

ডুমকা রসিকপুর হইতে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দে উকিল মহাশয় লিখিয়াছেন,—

আমাদের সমাজ অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আদি সমাজ হইতে আসিয়া আমরা বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় প্রথমতঃ ৬টি গ্রামে বাস করিয়াছিলাম। গ্রামের নাম যথা—১ যশপুর, ২ ছবরাজপুর, ৩ কড়েড, ৪ সেমেন্সে, ৫ পারষণ্ডী, ৬ মধুনগর ;—এই ৬টি গ্রামে বাস করাহেতু আমাদের সমাজ ছয় "থাকে" সমঅংশে বিভক্ত হইয়াছে। পরে কোন অজ্ঞাত কারণ হেতু বিভিন্ন থাকের বিবাদ হওয়ায়, ২ থাক একপক্ষ ও অপর ৪ থাক অন্য পক্ষ অবলম্বন করেন। প্রত্যেক থাকের সংখ্যা ১০৮ ঘর। বিবাদের পর হইতে একপক্ষ ২১৬ ঘর বলিয়া ও অন্যপক্ষ ৪৩২ ঘর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই বিবাদে আদান প্রদানও সামাজিক আচার ব্যবহারের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই অর্থাৎ উভয়পক্ষের মধ্যে আদান প্রদান হইয়া আসিতেছে। আমাদের পুত্র কন্যার বিবাহ এই দুই জেলার মধ্যেই হইয়া থাকে। এই জন্যই আমাদিগকে আদান প্রদানে সবিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কন্যার বিবাহে মনোনীত বর পাইলে, উপযুক্ত ঘর পাওয়া যায় না এবং ঘর পাইলে, বরের অভাব হয়। পুত্রের বিবাহেও কখন কখন উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানীয় সমাজের সম্মিলন-প্রার্থনার এই একটি মূল কারণ।

সে যাহা হউক, ইহারই মধ্যে কোনরূপে কষ্ট স্বীকার করিয়া, পিতা মাতা কিংবা আত্মীয় স্বজন বর কন্যা নির্ব্বাচন করেন। এইরূপে বর ও পাত্রী নির্দ্দিষ্ট হইলে, "আশীর্ব্বাদের" দিন স্থির করা হয়। ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজন সমক্ষে ধান দূর্ব্বা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা আশীর্ব্বাদ করা হয়। পূর্ব্বে বরপক্ষীয় লোকেরাই কন্যাকে অগ্রে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিত। কিন্তু অধুনা পাত্রের অভাব হেতু অধিকাংশ স্থলেই কন্যাকর্ত্তারাই প্রথমে পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। আশীর্ব্বাদের সময় পাত্র ও পাত্রীকে উপযোগী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দেওয়া হয়। এইরূপে আশীর্ব্বাদ সমাধা হইলে, কন্যাকে বাগ্‌দত্তা বলা হয়। সম্বন্ধ দৃঢ় রাখাই আশীর্ব্বাদের মূল উদ্দেশ্য ; কিন্তু এখন অনেক স্থলে সে উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

আশীর্ব্বাদের পর বিবাহের দিন স্থির করা হয়। ঐ বিবাহ সম্পাদনজন্য, আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ-প্রথা তিন প্রকার, যথা ১ অন্তরঙ্গ ২ গ্রামী ৩ শতেকী। আত্মীয় স্বজনকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইলে, অন্তরঙ্গ নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নিকটবর্ত্তী কতিপয় নির্দ্দিষ্ট গ্রামের কুটুম্ব লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করার নাম গ্রামী নিমন্ত্রণ। পূর্ব্বোক্ত ২১৬ এবং ৪৩২ ঘরের কুটুম্ব মহোদয়গণকে লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করার নাম শতেকী নিমন্ত্রণ। যিনি

যেরূপ যোগ্য ব্যক্তি, তিনি সেই প্রকারের নিমন্ত্রণ করিয়া কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

সাধারণতঃ বিবাহের পূর্ব্বদিনে অধিবাস বা গাত্রে হরিদ্রা দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বরের গাত্রে অগ্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়। বরকর্ত্তা কন্যার জন্য "অধিবাস-বস্ত্র" প্রেরণ করেন। উক্ত বস্ত্র পরিধান করাইয়া, কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়।

বিবাহের রাত্রে, পাত্র সভাস্থ হইলে, ব্রাহ্মণ, পূজনীয়লোক এবং বরকর্ত্তার বরণের পর, পাত্রকে সুপারি ও পট্টবস্ত্র দিয়া বরণ করিতে হয়। সেই সময় কন্যাকর্ত্তার অন্যান্য জামাতৃগণকেও সুপারি ও যথাযোগ্য বস্ত্র দিয়া বরণ করিতে হয়। তদনন্তর বৈদিক প্রথামত বিবাহ সমাধা হইলে, কন্যাকর্ত্তা জামাতাকে সাধ্যানুসারে স্বর্ণাঙ্গুরী, কাংসনির্ম্মিত কলস, ঘটী, থালা, বাটী, গেলাস, গাড়ু, পানপাত্র ইত্যাদি দ্রব্য এবং আধুনিক প্রথানুযায়ী ঘড়ি চেন প্রভৃতি প্রদান করেন এবং অধুনা সালঙ্কারা কন্যার দানপ্রথা অনেকস্থলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল দ্রব্য সাজাইয়া দান করিবার জন্য সভাস্থ করা হয়। বিবাহের পর বরকর্ত্তা নববধূকে ইচ্ছানুসারে অলঙ্কারাদি প্রদান করেন। তদনন্তর পাত্র ও কন্যাকে গৃহান্তরে লইয়া যাওয়া হয় এবং লৌকিক প্রথানুসারে ফুলশয্যা করা হয়। পরদিন "সুকৃতি-ভোজনের" সময় কন্যাকর্ত্তা কুলীন না হইলে, তাঁহাকে কুলীনের সম্মান দিতে হয়। সেই সময় তাঁহার জামাতাদিগের মধ্যে কেহ কুলীন থাকিলে, তাঁহাকে পৃথক্‌ভাবে সম্মান করিতে হয়।

পল্লীসমাজে "দে দত্ত পাল সেন" কুলীন। সুকৃতি-ভোজনের পর ফুলশয্যার জন্য বরকর্ত্তা সাধ্যানুসারে সুগন্ধি তৈল এসেন্স আতর হরিদ্রা সিন্দুর আলতা ইত্যাদি দ্রব্য এবং টাকা দিয়া থাকেন। টাকার সংখ্যা ৫৲ হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

বর ও কন্যার স্ত্রী-আচার হইয়া থাকে। বিবাহের সমারোহ ফেরত আসিলে বরকর্ত্তাকে বৌভাত দিতে হয়। সেই দিবস নববধূকে হাঁড়ি ছোঁয়ান হয়। নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনবর্গ বরের বাটীতে নগদ টাকা ও কন্যা বাড়ীতে ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য দ্বারা লৌকিকতা করেন। এই সব দ্রব্য ফেরত দেওয়া হয় না, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণেও সেইরূপ লৌকিকতা করিতে হয়।

বর ও কন্যা অষ্টমঙ্গলা করিবার জন্য জোড়ে শ্বশুর-বাড়ী গমন করে এবং সেই সময় বর কন্যার পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে টাকা দিয়া নমস্কার করে। যে সকল ব্যক্তিকে নমস্কার করা হয়, তাঁহারা জামাতাকে উপযুক্ত বস্ত্র প্রতিদান করেন।

কৌলীন্য প্রথানুসারে বরকে নগদ টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সামাজিক নিয়ম নাই; তবে পাত্রের অভাবে এখন ভাল ঘর ও বর পাইলে কন্যাকর্ত্তা বরকে নগদ টাকা পণ-স্বরূপ দিয়া থাকেন; এমন কি কন্যাকেও সালঙ্কারে দান করিতে হয়।

অন্য পক্ষে দরিদ্রেরা কন্যার পণ-গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেন।

বৈশ্যত্বের আলোচন।

বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। তাহা হইতে বৈশ্য শব্দের অর্থ উপভোগকারী হইয়াছে। যে জাতি অন্যত্র হইতে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্ নামে খ্যাত হন। এই জন্য বিশ অর্থে মনুজ ও বৈশ্য দুইই বুঝায়। অভিধানে দেখা যায় যে, বৈশ্যশব্দের অপর অর্থ উপভোগকারী। ইহাতে তাঁহারা যে ভারতবর্ষ প্রথমে অন্যত্র হইতে আসিয়া অধিকার করেন, ইহা বুঝা যায়। ঋ ধাতুর অর্থ গতি। সুতরাং বিশ ও ঋ ধাতুর অর্থগত কোন প্রভেদ নাই। আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৈদিক কালে আর্য্যদিগকে বিশ ও জন কহিত। এতাবতা আর্য্য জন সাধারণের নাম বৈশ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। ঋগ্বেদ রচনার পর যাঁহারা গুণ কর্ম্মে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র হইলেন, তাঁহারা আর বিশ বলিয়া গণ্য হইতেন না। এই বিশ শব্দ হইতে পরবর্ত্তী কালে বৈশ্য শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

ভারতে উপনীত আর্য্য জাতির একটি বিশেষত্ব আছে। ইহা তাঁহাদের পারমার্থিকতা। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই পারমার্থিকতা উপলক্ষে মতভেদ হইয়া পার্শী জাতির পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভট্ট মোক্ষমূলর কহেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় ভাষা বিজ্ঞান সত্য। তিনি ভাষা বিজ্ঞান হইতে বৈদিক ও জেন্দ আবস্তিক জাতির পূর্ব্বপুরুষ এক, স্থির করিয়াছেন। ভারত আগত আর্য্যগণের পারমার্থিকতা হইতে যাজ্ঞিকতা উদ্ভূত হয়। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের বিশেষত্ব তাহাদের অযাজ্ঞিকতা বা পরমার্থহীনতা। এতদ্দ্বারা ভারতীয় আর্য্যজাতির দুইটী প্রধান ভাবের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। প্রথম শুচিতা, দ্বিতীয় জাতিভেদ। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের মানব সমাজে তদ্রূপ শুচিতা ও জাতিভেদ বিদ্যমান নাই। উল্লিখিত দুইটী বিশেষ ভাবের কারণ এক পারমার্থিকতা বা যাজ্ঞিকতা। অযাজ্ঞিকের দ্রব্য দেবসমীপে অগ্রাহ্য। যাজ্ঞিকের দ্রব্য বা উপহার দেবতার গ্রহণীয়। এতদনুসারে অযাজ্ঞিকের অন্ন ও জল দেবগ্রাহ্য নহে। ইহাই শুদ্ধাচারের মূল মন্ত্র। যাজ্ঞিক অর্থে যাজ্য। অনার্য্যেরা যাজ্ঞিক নহে, সুতরাং অযাজ্য।

পৌরাণিক কালে পরমার্থরত ভারতবাসী দেবতার অপ্রিয় অযাজ্যের জল ও অন্ন ব্যবহার করা অপমানজনক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ হইয়া গেল। বর্ত্তমান জাতিভেদের ইহাই কারণ। তাহার ক্রম বিকাশে এক জাতির মধ্যে ভোজ্যান্নতা রহিত হইয়া উপজাতির সৃষ্টি হইতে থাকে। কাহাকেও জাতিচ্যুত করিতে হইলে ইদানীং সেই পূর্ব্বকালের আর্য্য অনার্য্যের যাজ্ঞিক ও অযাজ্ঞিকতা হইতে উৎপন্ন যাজ্য ও অযাজ্য ভাবগত জল আচরণীয়তা মূলক অন্ন ও পাণিগ্রহণ সংশ্রব রহিত করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। মহাভারতীয় কালে গুণ কর্ম্মানুযায়ী মানবের বৃত্তিগত বর্ণচতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে আর্য্য জাতিতে শূদ্র নামে শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে।

তাম্বুলী জাতি শূদ্র নামে পরিচিত হইলেও তাহারা বৈদিক কালের আর্য্য ও মহাভারতীয় কালের বৈশ্য। অদ্যাপি তাহাদের ধমনীতে আর্য্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ইহা ব্রাহ্মণের সহিত বর্ণ ও আকার গত সাদৃশ্য দেখিয়া তুলনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে। তাহারা যাজ্য ও শুচি। সুতরাং জল আচরণীয়। ইহা আর্য্যোচিত যাজ্ঞিকতার পরিচায়ক। বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, বৈশ্যজাতির সাধারণ নাম বণিক। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছে। শিল্প কৃষি ও বাণিজ্যকে বণিক্ পথ কহে। তাম্বুলী এই পথাবলম্বী। বণিক পথাবলম্বী শাঙ্খিক কাংসার ও গান্ধিক জাতি শংখবণিক, কাংস্যবণিক ও গন্ধবণিক নামে বিখ্যাত। তাম্বুলী জাতির পক্ষে তাম্বুল বণিক নামে খ্যাত হইবার কোন বাধা নাই। বৈশ্যের লক্ষণ ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। আপৎকালে ব্রাহ্মণের তাম্বুল ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাদ অনুসারে যজ্ঞোপবীত হইতে তাম্বুলবল্লী উৎপন্ন এবং প্রথমতঃ এক ব্রাহ্মণ তাম্বুল উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাম্বুল সম্মান প্রদর্শনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎব্যবসায়ীগণ সম্মানিত জাতিরূপে গণ্য হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কনৌজের রাজসভায় তাম্বুল ও আসন প্রাপ্ত হওয়া গৌরবের বিষয় ছিল।

"তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাত্।"

নৈষধ।

তাম্বুলীর ইতিহাসে কান্যকুব্জের নাম প্রথমে দৃষ্ট হয়। পশ্চিমাঞ্চলে কণৌজিয়া নামে তাম্বুলীর একটী শ্রেণী আছে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অবশ্য কান্যকুব্জ হইতে আগত। নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী ও বণিক্‌শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরির আদি পুরুষ কণৌজ হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানে বাসস্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। এই নবাগত বংশের কন্যার পাণিপীড়ন উপলক্ষে দলভেদ হইয়া ৪২ ও ১৪ র থাক উৎপাদন করে। ক্রমশঃ প্রসার বৃদ্ধি হইয়া অধুনা বঙ্গীয় তাম্বুলী সমাজ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় দলভেদের মর্য্যাদায় অধীর হইয়া ঐতিহাসিক স্মৃতিকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞানে তুচ্ছ করত কোন তাম্বুলী অপর শ্রেণীর স্বজাতিকে "তাম্বুলী নহে" বলিতে কুণ্ঠিত হন না। অপর দিকে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন ভাগিরথীর পূর্ব্বপারে আবদ্ধ সমাজ অপর শ্রেণীকে "রেঢ়" বা "রাঢ়িয়" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। ইহা জাতিভেদের চমৎকার ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। এ অবস্থায় বাঙ্গালী সমাজে তাম্বুলীকে বৈশ্যরূপে গ্রহণ করাইতে পুরুষানুক্রমে চেষ্টা না করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈশ্যবর্ণের জীবিকার জন্য সময়াভাব ঘটায় পারমার্থিক বিষয়ে ঔদাসিন্য জন্মে। তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপ হইতে থাকে। পুরুষানুক্রমে এইরূপ হওয়ায় বৈশ্যবর্ণ শূদ্ররূপে গণ্য হইল। অপরাপর জাতির ন্যায় তাম্বুলীর পূর্ব্বপুরুষগণও উক্ত কারণের বশীভূত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। যে বৈশ্যবর্ণের ভাগ সমাজে অত্যধিক ছিল, ক্রমে তাহা প্রায় তিরোহিত হইয়া গেল। বহুকাল পরমার্থ লইয়া জীবন যাপন অধিক :লোকে কদাচ করিতে পারে না। উদীয়মান পৌরাণিক যুগে সংহিতাদি প্রকটন কালে পরমার্থের নিতান্ত পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ জাতি ক্রিয়া বর্জ্জিত তাবৎ ব্যক্তিকে শূদ্রোচিত পারমার্থিক অনুষ্ঠানে রত করাইয়াছিলেন।

আজকাল বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের আলোচনা অথবা বঙ্গীয় তাম্বুলীর বৈশ্যত্বের আলোচনা দেখিয়া অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা অধিক চিন্তাশীল, ধর্ম্মপিপাসু ও হিন্দু সমাজের শ্রীবৃদ্ধিকামী, না, যাঁহারা ইহার প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন, তাঁহারাই যথার্থ হিন্দু ও ধর্ম্মপিপাসু একথা অগ্রে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে চলিলেই

লোকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে—ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ কার্য্যে অধিক চিন্তা বা অধিক আয়াস নাই—এমন কি উহা চিন্তা শূন্যতারই পরিচায়ক। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব ব্রত অবলম্বন করিতে উদ্যত হইতেছেন, তাঁহারা ধর্ম্মপথে অধিকতর অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, না, যাঁহারা উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মচিন্তা শূন্য হইয়া জীবনব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী আছেন, তাঁহারা অধিক ধর্ম্মপরায়ণ। সদাচারী ও সংযমী থাকিয়া আজীবন ব্রতধারী হইয়া যাঁহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা অধিক প্রশংসনীয়, না, যাঁহাদের জীবনে কোন ব্রত নাই, কোন আচার নাই, কোন শাস্ত্রচিন্তা নাই, কেবল অর্থ উপার্জ্জনে কামনার উপভোগই যাঁহাদের সংসার যাত্রার চরম লক্ষ্য, তাঁহারাই অধিক প্রশংসনীয়, এ কথা বিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আজকাল প্রকৃত আর্য্যভাব, প্রকৃত হিন্দুভাব সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে—পরস্পর ব্রতধারণ করিয়া পরস্পর সমাজের হিতকামী হইয়া—সদাচারে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া জীবন ক্ষেপণ করা কাহারও জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা হিন্দু বলেন, তাঁহারা মুখেই হিন্দু বলিয়া থাকেন, কিন্তু মনোগত বা কার্য্যতঃ কেহই হিন্দু নহেন—সকলেই ঘোর স্বার্থপর। হিন্দুসমাজের ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যায় যে, হিন্দুগণ কোন সমাজভুক্ত নয়—ইহারা সামাজিক ব্যক্তি বিশেষ নয়—ইহাদের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা নাই—পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত নাই—ইহারা কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নয়—ইহাদের জীবনের লক্ষ্য কেবল যে কোন উপায়ে হউক, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া—সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া—ধর্ম্ম, ঈশ্বর বা পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিছু অর্থ উপার্জ্জন করতঃ স্ত্রীপুত্র পরিবারাদি প্রতিপালন করা। সুতরাং এ সমাজে কোন ধর্ম্ম কথা বলা অথবা ধর্ম্মের আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুসমাজ এক্ষণে বিষয়ীর সমাজে পরিণত হইয়াছে, অথচ ইহা যে প্রকৃত পক্ষে বিষয়ীর সমাজ তাহাও নহে। যে সমাজ বিষয় চিন্তায় অগ্রসর, তাহাদের মধ্যে যেরূপ একপ্রাণতা, জাতীয়তা, কর্ত্তব্য-বোধ প্রভৃতি আছে, আমাদের মধ্যে তাহারও লেশমাত্র নাই। ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতিরা যাহারা বিষয়-প্রাণ, তাহাদের আচার ব্যবহার ও সামাজিকতাও আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। সুতরাং বর্ত্তমান

হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার না ধর্ম্মদৃষ্টি না বিষয়দৃষ্টি প্রণোদিত। ধর্ম্মের জন্য যদি অভাব বোধ হইত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এই বৈশ্যত্বের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইত না। আমরা বৈশ্য হইলে শূদ্রেরা আমাদের সেবা করিবে এই উচ্চ আশা বা গর্ব্ব প্রেরিত হইয়া আমরা এই বৈশ্যত্বের আলোচনা করিতেছি না। অনেকে বলেন, আজকাল শূদ্রগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা দাস উপাধি ত্যাগ করিয়া বৈশ্যোচিত ভূতি উপাধি ধারণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের দাস বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন। পরন্তু এরূপ বিবেচনা করাও সঙ্গত নহে। আমরা বুঝি যে, যে সমাজে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সেই যথার্থ ঈশ্বর নির্ম্মিত সমাজ। জ্ঞান ও ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করা স্বাভাবিক। আমরাও বুঝি যে আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ ঋণের পার নাই। ব্রাহ্মণগণই এ সমাজে সর্ব্বত্যাগী ও বৈরাগী হইয়া ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল জ্ঞান ও তপস্যায় রত থাকাতেই এ সমাজে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র সকলের উদ্ভাবন হইয়াছে। আমাদের জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, সকলই সেই বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ প্রসাদাৎ। ব্রাহ্মণ যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় এ সমাজে পূজনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা আমাদের উপাধিতে দাস না লিখিয়া ভূতি লিখিলেই যে ব্রাহ্মণ মর্য্যাদার হানি হয়, তাহা নয়। বরং দাস না লিখিয়া আমরা যদি ভূতি লিখি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। আমরা ব্রাহ্মণাচার অনুকরণে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মপথের অনুকুল সহায় হইয়া যদি বৈশ্যোচিত ভূতি নাম ধারণ করি, তাহা হইলে আমরা যথার্থ ব্রাহ্মণ ভক্ত হইব, না যাঁহারা ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার হইতে বহুদূরে থাকিয়া ব্রহ্ম কার্য্যের কোন প্রকার আনুকূল্যে বঞ্চিত থাকিয়া দাস উপাধিধারী হইয়া জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের ভক্তি অধিক প্রকাশিত হইবে? লোকে হঠাৎ বিপরীত বা কুদিকই দেখে, তাই আমাদের এই বৈশ্যত্বের প্রসঙ্গে তাঁহারা আমাদিগকে সমাজদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া উপহাস করেন। আমরা যদি বিরুদ্ধবাদী হইতাম, অথবা সমাজদ্রোহী হইতাম, তাহা হইলে আমরা সমাজ

হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া ইহার দ্রোহকার্য্য সম্পাদন করিতাম—বৈশ্য নামেই বা এত গর্ব্ব প্রকাশ করিব কেন? যাঁহারা ধীরভাবে সমাজতত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই বর্ত্তমান ব্রহ্মণ্য সমাজ কিছুতেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে লইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ দিন দিন যে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া শূদ্র অপেক্ষাও অধম পদবীতে গমন করিতেছেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে। কেবল এই সমাজ বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বিভক্ত হইয়া শূদ্রপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ যে সমাজে বিদ্যমান নাই—যে সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, সেই সমাজের ব্রাহ্মণগণ একেবারেই শূদ্র পদবীতে স্খলিত হইবেই হইবে। আমরা, বৈশ্য ব্রতধারী হইতে প্রয়াস পাইলে সমাজে দ্রোহ হওয়া দূরে থাকুক, সমাজ আরও পুষ্টিলাভ করিবে? অতএব আমাদের এই বৈশ্যত্বের অবতারণা প্রসঙ্গে হঠাৎ কোন বিদ্রূপ বা শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া অথবা এই প্রসঙ্গকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া ধীরভাবে বিচার করিবেন, এই আমাদের প্রার্থনা। আমরা যে বঙ্গীয় তাম্বুলীর বৈশ্যত্বের অবতারণা করিতেছি, ইহার নানা কারণ আছে। একেবারে পক্ষপাতী না হইয়া ধীরভাবে বিচার করিলে এই সকল কারণ সঙ্গত কি না তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ আমরা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিব, যে আমরা বৈশ্য। শাস্ত্রে আছে যে—

পশূনাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়ন মেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

পশুপালন, দান, যজন, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত সুদগ্রহণ অর্থাৎ তেজারতি মহাজনী এবং কৃষিকর্ম্ম এই সকল বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। উপরে যে বচন উদ্ধৃত হইল, উহা মনুর বচন। মনুর ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ গ্রন্থ আর ভারতবর্ষে নাই। অপরাপর শাস্ত্রেও বৈশ্যদিগের বৃত্তিবিধানঃ এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।

বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মই কৃষি, গোরক্ষা, এবং বাণিজ্য প্রভৃতি। বিচার করিয়া দেখুন যে যে কর্ম্ম বৈশ্যত্বের নিদানীভূত সে সমুদয় কর্ম্ম আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমাদের মধ্যে কৃষি, গোরক্ষা, যজন, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য এবং তেজারতী ও মহাজনী প্রভৃতি সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল কর্ম্মই আমাদের স্বাভাবিক বা সহজ কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সকল কর্ম্ম আমাদের সহজ বা সহজাত কর্ম্ম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ চৌর্য্য, দাসত্ব, পশুপক্ষী শীকার প্রভৃতি অপকর্ম্মে আপনাদিগকে নিয়োজিত না করিয়া মনের মাহাত্ম্য বশতই চিরকাল এই সকল সৎপথে থাকিয়া আর্য্যসমাজের হিতচিন্তা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন কালে কে তাঁহাদিগকে এই সকল সৎকর্ম্ম অবলম্বনে ঈঙ্গিত করিল? বিধাতা তাঁহাদিগের মনে কথঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের সঞ্চার না করিলে কি তাঁহারা আপনাপনি ঐ সকল কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইতেন? সংসারে কতপ্রকার উপায়ে লোকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; অসৎ ও তমোগুণ প্রধান অলস ব্যক্তিগণ চৌর্য্য, পরস্বাপহরণ, পশুশীকার, রজক, ভারবাহক, পরিচারক, লোকের কুবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া মদ্যপ্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা কত অসৎ উপায়ে অর্থার্জ্জন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেন সেই আদিম কাল হইতে কষ্টসত্ত্বেও সৎ ব্যবসায় ও বাণিজ্যাদি জীবনোপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, ভগবান্ যে বলিয়াছেন—

"কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।"

অর্থাৎ স্বাভাবিক মনের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা বশতই লোকে আপনাপন বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে এবং এইরূপেই আমি তাহাদের কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিয়াছি। আজকাল সব বিষয়ে একাকার; সর্ব্বত্র ম্লেচ্ছভাবে পরিপূর্ণ, এক্ষণে কর্ম্মবিষয়িণী লোকের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি কি, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার, মনের ইচ্ছা একরূপ থাকিলেও লোককে দায়ের গতিকে এমন কি তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু অতি পুরাকালে সমাজের অবস্থা সেরূপ ছিল না— তখন এখনকার ন্যায় লোকবৃদ্ধি ও জীবিকার সংগ্রাম ছিল না; তখন সকলেই

প্রবৃত্তিমত স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে পারিত, সুতরাং তখনকার কালের বৃত্তি অবলম্বন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৃত্তিগ্রহণকারী সাত্ত্বিক গুণ প্রধান বা তামসিক গুণ প্রধান। অতএব আমাদের এই সকল বৃত্তি যে কথঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের পরিচায়ক, তাহাতে আর সংশয় নাই এবং এই সকল বৃত্তি যে আমাদের মধ্যে আজকাল অবলম্বনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। আবার শুদ্ধ যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাভাবিক প্রেরণায় আমাদের জন্য এই সকল বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে। এই সকল বৃত্তি দ্বারা কেবলমাত্র ধনোপার্জ্জনই যে তাঁহাদের একমাত্র জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাহা নহে। জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে দান, ইজ্যা ও অধ্যয়ন ছিল। নীচ জাতীয়গণের ন্যায় যে সে ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অর্থার্জ্জন দ্বারা আত্মোদর পোষণই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠেয় ছিল না। তাঁহারা সাধু ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থার্জ্জন দ্বারা যাগ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি করিতেন। ইহাই তাঁহাদের দ্বিজত্বের ও সাত্ত্বিক গুণের পরিচায়ক ছিল। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহী দ্বিজের অবশ্য কর্ত্তব্য—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে তাহা ছিল এবং আমাদের মধ্যেও তাহা আছে। ন্যায়পথে কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র পরিবার পোষণ, ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দান, অতিথি সেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবপূজা, হোম, পুরাণাদি কথকতা দেওয়া, পুষ্করিণী খনন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যও তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যায়পথে থাকিয়া কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার পোষণ, দশজনের হিতসাধন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দোল দুর্গোৎসবাদি দেবযজ্ঞ, আত্মীয় ও ব্রাহ্মণ সজ্জন ভোজনাদিতে নরযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদিতে পিতৃযজ্ঞ ও মন্ত্রাদি জপ ও চিন্তনে ঋষিযজ্ঞ যাঁহারা পুরুষ পরম্পরা ক্রমে আজীবন সমাধা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যদি বৈশ্য না হইবেন, তবে সমাজে আর বৈশ্য কে হইবে? ইহা অপেক্ষা বৈশ্যজীবন আর কোন্ উচ্চতর আদর্শে সংগঠিত হইতে পারে? প্রাচীন ও বর্ত্তমান তাম্বুলী সমাজের ক্রিয়া কর্ম্ম ও আচরণাদি দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে তাম্বুলীজাতি বৈশ্য লক্ষণ বিশিষ্ট এবং পূর্ব্বে

বৈশ্যই ছিল। তবে যেখান হইতে বর্ণভেদের মর্য্যাদা শিথিল হইয়াছে, যখন হইতে সমাজের উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছে, যখন হইতে হিন্দুসমাজ পরাধীন হইয়াছে, তখন হইতেই ইহাদের মধ্যে বৈশ্যমর্য্যাদা ও বৈশ্যজনোচিত শিক্ষা তিরোহিত হইয়া ইহারা দিন দিন অধঃপতনোন্মুখ হইতেছে এবং যদি এখনও বৈশ্যপদবীতে উন্নত হইবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে আরও অধঃপাতিত হইবে।

মনু বলিয়াছেন, যথায় যথায় বর্ণসন্দেহ উপস্থিত হইবেক, তথায় তথায় সেই সকল বর্ণের আচার ব্যবহার দর্শনে তাহাদের বর্ণ নির্ণয় করিবেক। এক্ষণে আমাদের সমাজে বর্ণ জিজ্ঞাসা উপস্থিত। কারণ

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ
চতুর্থঃ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ।"

শাস্ত্রের বচন এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্রজাতি, জাতি গণনায় পঞ্চম আর নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে বর্ণজিজ্ঞাসা এই যে, আমরা কোন্ জাতিমধ্যে পরিগণিত হইব? আমরা বৈশ্য কি শূদ্র জাতিতে পরিগণিত হইব? যদি বৈশ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত না হইলাম, তাহা হইলে অবশ্যই শূদ্র জাতি হইব? কিন্তু কথা এই, বর্ত্তমান সমাজে আমাদিগকে সৎশূদ্র বা জলাচরণীয় শূদ্র আখ্যা প্রদান করে। শূদ্রের মধ্যে যে সৎ ও অসৎ বিভাগ, ইহা মন্বাদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। ঐরূপ বিভাগ বেদসঙ্গত নয়। উহা লৌকিক বিভাগ মাত্র। যখন আমাদের মধ্যে শূদ্র না বৈশ্য এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত, তখন বৈদিক বর্ণবিভাগ অনুসারেই আমাদের সন্দেহ উত্থাপিত এবং বৈদিক প্রণালীতেই সেই সন্দেহের নিরাকরণ করিতে হইবে। এইরূপে বর্ণসন্দেহ উপস্থিত হইলে মনুর মত যাহা সম্পূর্ণ বেদানুযায়ী ও বেদমূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদনুসারেই চলিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন, বর্ণসন্দেহ স্থলে বর্ণগণের অনুষ্ঠিত আচার দৃষ্টেই তাহাদের বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে। আমরা পুরুষ পরম্পরা ক্রমে সদাচারী ও বৈশ্যোচিত নিষ্ঠাবান্, সুতরাং আমরা বৈশ্য নয় কি? মনু বলিয়াছেন—

"বিত্তং বন্ধু র্বয়ঃকর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্য স্থানানি গরীয়ো যদ্‌যদুত্তরং॥"

অর্থাৎ ধন, বন্ধু, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা—এই পাঁচটী মান্যের স্থান। ইহার মধ্যে পর পরই অধিক মান্য। দাসত্বজীবী অপেক্ষা যাহারা কৃষি ও বাণিজ্যজীবী তাহাদিগেরই অধিক ধনাগম সম্ভাবনা ও তাহাদিগেরই অধিক আচারবান্ হওয়া সম্ভব, সুতরাং ধন ও কর্ম্ম এই দুই বিষয়ে কৃষি ও বণিক্ সম্প্রদায় উৎকর্ষতা প্রাপ্ত বলিয়া তাহারা সমাজে মাননীয় কেন না হইবে? মনুর এই মান্য স্থান গণনানুসারেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বোচ্চ মান, ক্ষত্রিয়ের তন্নিম্নে ও বৈশ্যের তন্নিম্নে এবং শূদ্র সর্ব্বনিম্নে প্রতিষ্ঠিত।

মনু আলোচনা করিলে বাঙ্গালী তাম্বুলী যে বৈশ্য, সে বিষয়ে বিস্তর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমন কি ঐ ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া আইসে। বৈশ্যের যে সকল কর্ম্মবিধি মনু লিখিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্মবিধি আমাদিগের মধ্যে আছে। মনু বলিয়াছেন, বৈশ্যবর্ণ উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দারপরিগ্রহানন্তর কৃষ্যাদি কার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। প্রজাপতি প্রথমতঃ পশু সকলকে সৃষ্টি করিয়া উহাদের প্রতি-পালনের নিমিত্ত বৈশ্যকে অর্পণ করেন এবং প্রজা সৃষ্টি করিয়া উহার রক্ষার্থ ব্রাহ্মণ ও রাজাকে প্রজা সকল অর্পণ করেন। ইহাতে জানা গেল যে, পশুপালনাদি কার্য্য নীচ নয়, পশুপালকেরাও বৈশ্য। তার পর মনু বলিতে-ছেন যে, বৈশ্যবর্ণ মণি মুক্তা প্রবালাদি, লোহ, বস্ত্র, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদি রস প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্যাদি ও উত্তম মধ্যম অধমাদি নির্ণয় করিবেন। বৈশ্য কোন্ বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শস্য হয়, এ বিষয়ে বিজ্ঞ হইবেন এবং ইহা উষর ভূমি—এই ভূমি শস্যপ্রদ—এইরূপে ক্ষেত্রের গুণ দোষজ্ঞ হইবেন এবং প্রস্থ, দ্রোণ, আঢ়ক, পালি, প্রভৃতি পরিমাণ ও তুলামান সম্যক্ অবগত হইবেন। তিনি গোপাল মহিষাদি পালকরূপ ভৃত্যের দেশকাল ও কর্ম্মের উচিত বেতনজ্ঞ হইবেন এবং বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে বিবিধ দেশের ভাষা অবগত হইবেন—আর এই দ্রব্য এইরূপে স্থাপিত করিতে হয় এবং ইহা এই দ্রব্যে মিশ্রিত করিলে নষ্ট হয় না এবং এই দ্রব্য দেশ কাল বুঝিয়া

এত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। বৈশ্যবর্ণ টাকা ধর্ম্মত সুদে খাটাইবেন এবং হিরণ্যাদি দান অপেক্ষা সকলকে বিশেষ রূপে অন্নদান করিবেন।

পাঠক! উপরে মনু যে সকল কর্ম্মবিধি বৈশ্যের জন্য স্থির করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল কর্ম্ম পাঠে জানা যায় যে, কৃষক এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং শিল্পজীবি লোক সকলই বৈশ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। ইহারা সকলেই ব্রতধারী ও সংস্কারার্হ।

শ্রাদ্ধে যাহাদিগের নিমন্ত্রণ করিতে নাই, যাহাদিগকে হব্যকব্যে আবাহন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়—সেই দ্বিজাতিগণের তালিকা দেখিলেও স্পষ্ট জানা যায় যে, যাহাদিগকে আমরা অন্ত্যজ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি, অতি প্রাচীন কালে তাহারাও দ্বিজপদ বাচ্য ছিল। মনু এক স্থলে লিখিয়াছেন—

"পরদারেষু জায়েতে দ্বৌসুতৌ কুণ্ড গোলকৌ।
পত্যৌজীবতিকুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥
তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাং॥"

অর্থাৎ পরস্ত্রীতে জাত যে কুণ্ড ও গোলক ইহাদিগকে হব্যকব্য প্রদান করিলে অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্বিজস্থলে নিমন্ত্রণ করিলে দাতার কর্ম্মনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে কি এমন অনুমান হয় না যে, অতি প্রাচীন কালে কুণ্ড ও গোলক প্রভৃতি জারজেরাও দ্বিজপদ বাচ্য ছিল?

আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥

অর্থাৎ সোমবিক্রয়কারী, তৈলজীবী, আগারদাহী প্রভৃতি দ্বিজকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। পাঠক! ইহাতে কি এমন অনুমান হয় না যে, তৈল-জীবীরাও দ্বিজপদ বাচ্য?

হস্তি গোঽশ্বোষ্ট্র দমকো শ্যেনজীবী তথৈবচ।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্য স্তথৈবচ॥

অর্থাৎ শ্যেন জীবী, হস্তি, গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমক এবং পক্ষিপোষক দ্বিজগণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।

পাঠক! শ্যেনজীবী—পক্ষিপোষক, গো অশ্বের দমক—যখন দ্বিজপদ বাচ্য, তখন তাম্বুলী বৈশ্য নয় কিসে?

"গৃহসম্বেশকো দূতো বৃক্ষারোপক এ বচ।"

অর্থাৎ যিনি জীবিকার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন, যিনি দৌত্য কর্ম্ম করেন, যিনি বৃক্ষরোপণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তিনি শ্রাদ্ধীয় দ্বিজ হইতে পারেন না।

এইরূপে মনুর শ্রাদ্ধীয় দ্বিজ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি ইতর কর্ম্মকারীরাও তৎকালে দ্বিজ সংস্কারে বঞ্চিত ছিল না।

আপদ্‌কালের ধর্ম্মে মনু বলিয়াছেন—

উভাভ্যাং অপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্‌ভবেৎ।
কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং॥

স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা না চলিলে, কৃষি গোরক্ষণাদি বৈশ্যের বৃত্তি ব্রাহ্মণ আপদ্‌কালে অবলম্বন করিবেন।

"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, আপদ্‌কালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও হিংসাবহুল ও পরাধীন কৃষিকার্য্য রূপ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। কেন না, যদিও কোন কোন পণ্ডিত কৃষিকার্য্যকে ভাল বলেন, তথাপি সাধুলোকেরা উহাতে অনেক জীব হত্যা হয় বলিয়া ঐ কার্য্য সাধু বিগর্হিত বলিয়া থাকেন।

"কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখং॥"

পাঠক! এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বারুই, সদ্‌গোপ প্রভৃতি যে সকল বৈশ্য জাতি কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তদপেক্ষা তাম্বুলী বৈশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।

আবার মনু আপদ্কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন বলিয়া ক্রয় বিক্রয়কারী সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যজীবী বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

"ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণং।
বিট্পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যদি আত্মবৃত্তির অসম্ভবে ধর্ম্মের প্রতি সম্যক্ রূপে নিষ্ঠা না রাখিতে পারে, তবে বৈশ্যের বিক্রীতব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যতীত অপরাপর দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

সর্ব্বান্ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃসহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ॥

বর্জ্জনীয় দ্রব্য সকল দর্শাইতেছেন—সকল প্রকার রস, সিদ্ধান্ন, তিল, প্রস্তর, লবণ, পশু, মনুষ্য এই সকল বিক্রয় করিবেন না। রসের মধ্যে লবণ গর্হিত হইলেও ইহার বিক্রয়ে দোষবাহুল্য প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অধিক হইবে। এজন্য লবণের পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা জানা যায় যে, এই সকল বিক্রয়কারীরা বৈশ্য ছিল।

সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধী॥

কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্র নির্ম্মিত সকল প্রকার বস্ত্র, শণ, অতসী, তন্তুময় বস্ত্র এবং মেষলোম নির্ম্মিত কম্বলাদি এ সকল রক্তবর্ণ না হইলেও বিক্রয় করিতে পারিবেক না এবং ফল মূল ও ঔষধি দ্রব্য সকলও বিক্রেয় নয়। তন্তুবায়, গাছগাছড়া বিক্রয়কারী বেনিয়া প্রভৃতি যে বৈশ্য, তাহা এতদ্দ্বারা জানা যায়।

অপঃ শস্ত্রং বিষং মাংসং সোমং গন্ধাংশ্চসর্ব্বশঃ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং তৈলং মধু গুড়ংকুশান্॥

আপদ্কালে বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় হইলেও তথাপি ব্রাহ্মণ জল, শস্ত্র,

বিষ, মাংস, সোমলতারস, কর্পূরাদি সমুদয় গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, গুড়, দর্ভ, মধু ও মোম বিক্রয় করিবেন না।

কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য বিক্রয়কারী গন্ধবণিক, ক্ষীর দধি ঘৃত বিক্রয়কারী গোপ সকল যে বৈশ্য, এতদ্দ্বারা তাহা জানা যায়।

আরণ্যাংশ্চ পশূন্ সর্ব্বান্ দংষ্ট্রিণশ্চ বয়াংসি চ।
মদ্যং নীলিঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা॥

অরণ্যবাসী সিংহ প্রভৃতি পশু, বৃহৎদন্তবিশিষ্ট পশু, শুক সারিকা প্রভৃতি পক্ষী, মদ্য, নীল, লাক্ষা, যাহাদের খুর জোড়া এমন অশ্বাদি পশু—এ সকল বিক্রয় করিবে না।

এ সকল বিক্রয়কারীরাও যে পুরাকালে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল—তাহা এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণীকৃত হয়।

কামমুৎপাদ্য কৃষ্যান্তু স্বয়মেব কৃষীবলঃ।
বিক্রীণীত তিলান্ শুদ্ধান্ ধর্ম্মার্থমচিরস্থিতান্॥

স্বয়ং কর্ষণ দ্বারা তিল উৎপন্ন করিয়া অন্য দ্রব্য না মিশাইয়া ধর্ম্মার্থ বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু তাহা উৎপত্ত্যনন্তরই বিক্রয় করিবে—লাভের জন্য অধিক দিন রাখিয়া বিক্রয় করিবে না।

ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

ভোজন, অভ্যঙ্গ ও দান ব্যতিরেকে যদি অন্য নিমিত্ত তিল বিক্রয় করে, তবে ঐ দোষে পিতৃ, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত কৃমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরের বিষ্ঠায় মগ্ন থাকে।

তৈলিক যে বৈশ্য জাতি তাহা উপরোক্ত শ্লোকে প্রমাণীকৃত হয়।

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রোভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ॥

ব্রাহ্মণ, মাংস লবণ ও লাক্ষা বিক্রয় করিবামাত্র পতিত হয় এবং ক্রমিক তিন দিন দুগ্ধ বিক্রয় করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইতরেষান্তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি॥

ব্রাহ্মণ, মাংসাদি ভিন্ন অন্য প্রতিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছা পূর্ব্বক সাত দিন বিক্রয় করিলে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

রসারসৈর্নিমাতব্যা নত্বেব লবণং রসৈঃ।
কৃতান্নঞ্চাকৃতান্নেন তিল ধান্যেন তৎসমাঃ॥

ঘৃতাদি রসের পরিবর্ত্তে গুড়াদি রস হইতে পারে, কিন্তু কখন লবণরসের পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে না। সিদ্ধান্নের পরিবর্ত্তে আমান্ন হইতে পারে, ধান্য দ্বারা তিল হইতে পারে, কিন্তু উহা সমান পরিমাণ জানিবে।

জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
নত্বেবং জ্যায়সীং বৃত্তিং অভিমন্যেত কর্হিচিৎ॥

বিপদাপন্ন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আপৎ কালোক্ত প্রকারে জীবিকা করিবে, কিন্তু কখন ব্রাহ্মণের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না।

পাঠক! এই সকল শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, উপরোক্ত ব্যবসা-জীবীরা হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য হইবে, কিন্তু কদাচ শূদ্র হইবে না। কেন না—

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥

যদি অধম জাতি লোভ বশম্বদ হইয়া উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে উহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া রাজা শীঘ্রই স্বদেশ হইতে নিষ্কাশন করিবেন। নতুবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সাঙ্কর্য্য উৎপন্ন হইবে। ব্রাহ্মণ রাজত্বকালে

বৃত্তিসাঙ্কর্য্য অর্থাৎ অধম জাতি উত্তম জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত না, কেন না বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষা করাই রাজার প্রধান কার্য্য ছিল। মুসলমান রাজত্বেও বৃত্তি বিশৃঙ্খলা ততটা উপস্থিত হয় নাই। কেননা, মুসলমান রাজত্ব কালে আমাদের সামাজিক ব্যাপার হিন্দুদিগেরই হাতে ছিল, তখনও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তি হিন্দুসমাজই করিত। পরন্তু এই ইংরাজ রাজ্যে যদিও বৃত্তি বিষয়ে সকলেই স্বাধীন, তথাপি সচরাচর দেখা যায় যে, প্রায় অধিকাংশ লোকই নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

বরং স্বধর্ম্মোবিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥

স্বকীয় কর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহাই করা উচিত, পরকীয় কর্ম্মকরণ অনুচিত। স্বকর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়া যদি পরকীয় কর্ম্ম করে, তবে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়।

পাঠক! শাস্ত্রের এইরূপ শাসন বৃত্তিসাঙ্কর্য্যের বিঘ্নকারক।

বৈশ্যো জ্জীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যানি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্॥

বৈশ্য যখন স্ববৃত্তিতে জীবিকা করিতে অক্ষম হইবে, তখন উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অকার্য্য না করিয়া দ্বিজসুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে কিন্তু শক্তিমান্ হইলে শূদ্রকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে।

উপরের শ্লোক দ্বারা জানা গেল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ ততটা দুষ্য নয়, যতটা বৈশ্যের শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ দূষ্য। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আপৎকালে বৈশ্যের বৃত্তিধারী হইলেও মদ্য প্রভৃতি বিক্রয়রূপ অকার্য্য করিবেন না—বৈশ্যও তদ্রূপ আপৎকালে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন বটে, কিন্তু শূদ্রের যে সকল অকার্য্য আছে, তাহা করিবেন না এবং শূদ্রবৃত্তি হইতেও যথাশক্তি নিবৃত্ত থাকিবেন।

উপরে দেখান গেল যে, বাণিজ্য ও কৃষিজীবিরা সাধারণতঃ বৈশ্য শ্রেণীতে পরিগণিত। তাম্বুল ব্যবসায়ীরা যে শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না

এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। শাস্ত্রীয় বচন সকল দেখাইয়া আমরা এ বিষয়ের প্রমাণ করিব। ব্যাস বলিয়াছেন, অন্যের উক্তি ততক্ষণ পর্য্যন্ত শোভা পায়, যাবৎ মনু না দেখা দেন। তাৎপর্য্য এই যে, বেদ ব্যতীত মনুর উপর প্রামাণিক গ্রন্থ অপরাপর স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ বা তন্ত্রাদি হইতে পারে না। অতএব আমরা মনু প্রমাণই দেখাইব যে, মনু যাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন, আমরা সে শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নহি।

মনুর মতে পৃথিবীতে যত জাতি আছে, তাহারা হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য, না হয় শূদ্র হইবে। বিধাতা কল্পিত এই বিভাগকে অতিক্রম করিয়া অপর কোন মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। একারণ তিনি চীন, যবন প্রভৃতি জাতি সকলকেও বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্র পদবী প্রদান করিয়াছেন। মনু বলেন—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে নচ॥
পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ঔড্র, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, অপহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ—ইহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, পরন্তু ক্রমে ক্রমে ক্রিয়া লোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর এক স্থলে আছে,

মুখবাহূরূপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচং চ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যে সকল জাতি ক্রিয়ালোপাদি দোষে বাহ্যজাতি ভাবাপন্ন হয়, উহারা ম্লেচ্ছভাষী বা আর্য্যভাষীই হউক, উহাদের সকলকেই দস্যুজাতি বলিয়া জানিবে।

মনুর মতে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই শূদ্রজাতি মধ্যে পরিগণিত। বেদেতে ইহাদিগকে দাস বা দস্যুজাতি শব্দে নির্দ্দেশ আছে। পাঠক! রাক্ষস ও পিশাচেরাও মনুর মতে শূদ্র জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ। মনু বলেন,—

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসীগতিঃ॥

অর্থ এই যে, হস্তী, অশ্ব, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও শূকর—ইহারা তমোগুণ নিমিত্ত মধ্যমা গতি। পরন্তু—

রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীযুত্তমা গতিঃ।

রাক্ষস ও পিশাচ সকল তমোগুণ নিমিত্ত উত্তমা গতি জানিবে। যেরূপ তমোগুণে শূদ্রের ও ম্লেচ্ছের জন্ম হয়, হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও ব্যাঘ্রেরও সেই তমোগুণে জন্ম। শূদ্রজীবন ঋষিচক্ষে এত অকিঞ্চিৎকর যে, শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অতি যৎসামান্য। এমন কি প্রায়শ্চিত্ত স্থলে লেখা আছে যে,—

মার্জ্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেব বা।
শ্বগোধোলূক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যা ব্রতঞ্চরেৎ॥

অর্থাৎ মার্জ্জার, নকুল, চাষ, মণ্ডুক ও কাক প্রভৃতির হত্যাকারীকে শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক।

অস্থিমতান্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চনেস্যানস্থান্তু শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ॥

অর্থ এই যে, কৃকলাস প্রভৃতি অস্থিবিশিষ্ট প্রাণীর সহস্র বধে এবং অস্থি বিহীন একশকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণীর বধে শূদ্রবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। পৃথিবীতে যত অকর্ম্মকারী, পাপকর্ম্মপরায়ণ, তমোগুণ প্রধান জাতি দেখিতে পাও, মনুর মতে সকলেই শূদ্র। অতএব শূদ্র শব্দের প্রসর অত্যধিক। এক্ষণে ইহাদের কর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করুন।